আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
International Trade

ইউনিট ৮

ভূমিকা

পৃথিবীর কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোনো একক দেশের পক্ষে তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশ নিজ দেশের বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি, জলবায়ু, ভৌগোলিক সুবিধার প্রেক্ষিতে পণ্য-সেবা উৎপাদনে বিশেষায়িত হয়। পৃথিবীর সকল দেশের সুযোগ-সুবিধা এবং উৎপাদন সমান নয়। ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনে ঘটে বৈচিত্র্য, বিনিময়, স্থাপিত হয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক। একাধিক দেশ যখন নিজেদের প্রয়োজনে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য-সেবা লেনদেনের একটি বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের ফলে শ্রমবিভাগের উপযুক্ত ব্যবহার, মূলধনের সঠিক প্রয়োগ ও গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন ভোগ করার সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকান্ড এগিয়ে যেতে পারে। এভাবে ঘটে বিশ্বায়ন যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্যাপী নিবিড় সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা দূরত্ব হ্রাস পায়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৮.১: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা

পাঠ ৮.২: আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

পাঠ ৮.৩: বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা

পাঠ ৮.৪: বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্য

পাঠ ৮.৫: বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি

পাঠ ৮.৬: বৈদেশিক সাহায্য, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ

পাঠ ৮.৭: বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

পাঠ ৮.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা
Concept of International Trade

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যতই শীর্ষে অবস্থান করুক কোনো ব্যক্তি বা দেশ একা তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সংস্থান করতে পারে না। অন্য ব্যক্তি বা দেশের উৎপাদিত পণ্য-সেবা তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। এ ধারণা হতেই আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থা তথা বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। **দেশের সীমানা পেরিয়ে দু বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবার বিনিময় সম্পন্ন হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।** বিশ্বের কোনো একটি দেশের সাথে অন্য কোনো দেশের বা একাধিক দেশের বৈধ প্রক্রিয়ায় যে বাণিজ্য চলে, তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, International trade is the exchange of goods or resources among the countries. অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সম্পদের বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। প্রাচীনকাল হতেই ইউরোপের বণিকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কলোনী স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পর চলমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়, গতি ও আওতা বৃদ্ধি পায়। মূলত তখন হতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন প্রয়োজনীয় পণ্য ও উৎপাদন কৌশল আদান প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি

পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেরই বিদ্যমান সম্পদ এবং উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের পার্থক্য, স্ব-স্ব দেশে উপকরণের প্রাচুর্যতার উপর নির্ভর করে উৎপাদন বা দুটি ভিন্ন দেশে দুটি ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধা ভোগ করার কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। দুটি দেশের মধ্যে উপকরণের সহজলভ্যতা, দক্ষতা ও উৎপাদনের মধ্যে বিশেষীকরণ এবং শ্রম বিভাগই হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। যে দেশ যে দ্রব্যটি বেশি উৎপাদন করে তার উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি করে বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য অন্য কোনো দেশ হতে আমদানি করে। এভাবে পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে দু বা ততোধিক দেশ বাণিজ্যে নিয়োজিত হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে **নিম্নোক্ত শর্ত** আবশ্যক :

১. একটি নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য,
২. কমপক্ষে দুটি দেশ ও এক বা একাধিক পণ্য প্রয়োজন,
৩. দেশসমূহ স্বাধীন-সার্বভৌম হওয়া প্রয়োজন,
৪. দুটি পৃথক সরকার, ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা বিদ্যমান,
৫. দুটি দেশে পৃথক বাণিজ্যনীতি বিদ্যমান ও
৬. পণ্য-সেবা বিনিময়ে লিখিত চুক্তি আবশ্যক।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বিষয়টি যেকোনো একটি দেশের প্রেক্ষিতে আলোচনা করলে সহজে অনুধাবন করা যায়। যেমন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো :

১. সম্পদের উত্তম ব্যবহার : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানির ফলে নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর উত্তম ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

২. উৎপাদন বৃদ্ধি : পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ নিজেদের সম্পদ ও উপকরণ প্রাপ্তির সুবিধা, দক্ষতা অনুসারে সর্বোচ্চ উৎপাদন করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলোর মোট উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উক্ত দেশসমূহের শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধির কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন* সুবিধা ভোগ করে।

৩. উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি : কোনো দেশ তার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দ্রব্য উৎপন্ন করে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে আয় বৃদ্ধি করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে তার উদ্বৃত্ত পণ্য কাজে লাগানো সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

পণ্য রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সাল	২০০৪-০৫	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
প্রাথমিক পণ্য	৬৪৮	১২৬৭	১৩১০	১৩৮০	১২৬৬
শিল্পজাত পণ্য	৮০০৬	২৩০৩৫	২৫৭১৭	২৮৭৯৮	২৯৯২২
মোট	৮৬৫৪	২৪৩০২	২৭০২৭	৩০১৭৭	৩১২০৯

[**সূত্র :** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬]

উপরের ছক থেকে বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নেওয়ার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুবিধা : কোনো দেশ কোনো বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করতে না পারলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অন্য দেশ থেকে তা আমদানি করে ভোগ করতে পারে। যেমন—বাংলাদেশ কম্পিউটার, সেলাই মেশিন, রেফ্রিজারেটর প্রভৃতি আমদানি করতে পারে। আবার পাট, চা, চামড়া অন্যান্য দেশে রপ্তানি করতে পারে।

৫. মূলধনী দ্রব্য আমদানি : বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র দেশের উন্নয়নের জন্য মূলধনী দ্রব্যের প্রয়োজন কিন্তু নিজেদের প্রযুক্তিতে জ্ঞান ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে এরূপ দ্রব্য উৎপাদনের কাঠামো স্থাপন করতে পারে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের মাধ্যমে কম খরচে মূলধনী দ্রব্য আমদানি করতে পারে।

৬. অত্যাবশ্যকীয় আমদানি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশ অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য যেমন—খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করতে পারে।

৭. খাদ্য ঘাটতি পূরণ : বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই খাদ্য ঘাটতি থাকে। এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সুবিধা থাকা প্রয়োজন। কারণ ঘাটতিকালীন সময়ে একাধিক দেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে তা পূরণ করা হয়।

৮. কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান : বাংলাদেশের মতো অনুন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এমতাবস্থায় এসব দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও পরিচালনা দক্ষতা লাভ করতে পারে।

---

* **অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচন :** ফার্মের আয়তন বাড়লে সূক্ষ্ম শ্রম বিভাগ প্রবর্তন করা সম্ভব, প্রচুর কাঁচামাল ক্রয় করতে হয়, সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যায়, পর্যাপ্ত মূলধন দ্বারা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যায়, উপজাত দ্রব্য ব্যবহার করা যায়, ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।
বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন : কোনো এলাকায় শিল্পাঞ্চল এর প্রসার ঘটলে প্রত্যেক শিল্পই একে অন্যের নিকট হতে কিছু সুবিধা ভোগ করে। এছাড়া সরকারের কর ও ভর্তুকি সুবিধা লাভ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদির ফলে সকল শিল্পই লাভবান হয় এবং তাদের নিজস্ব ব্যয় হ্রাস পায়।

৯. ভোক্তাদের সুবিধা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত দেশের ভোক্তাগণ কম মূল্যে উন্নতমানের পণ্যদ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে পারে।

১০. দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে বিশ্বব্যাপী দেশীয় বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনকারীদের উৎপাদন ক্ষমতা এবং মুনাফা উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

১১. মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি : বাংলাদেশের সাথে একাধিক দেশের বাণিজ্যিক সুবিধার কারণে মূলধনের আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে এর গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

১২. মানব সম্পদ রপ্তানি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত দেশসমূহ শ্রমশক্তি বা মানবসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এর মাধ্যমে দেশীয় শ্রমবাজারের বেকারত্ব হ্রাস পায়, দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

১৩. নির্ভরশীলতা হ্রাস : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো লাভবান হলে ধীরে ধীরে অর্থনীতি স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

১৪. জরুরি অবস্থা মোকাবিলা : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কারণে জরুরি অবস্থা দেখা দিলে অন্য দেশ হতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করে অথবা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অতি সহজেই এরূপ সংকট মোকাবিলা করা যায়। সাম্প্রতিককালে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভারতসহ কয়েকটি দেশে 'সুনামি' পরবর্তী যে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরোক্ষ প্রভাব বলা যায়।

১৫. দক্ষতা বৃদ্ধি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলোর উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কারণ এ ধরনের উৎপাদকগণ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কম খরচে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত হয়।

১৬. জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার : বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে এবং এর ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে।

১৭. একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ : বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা দেশের মধ্যে একচেটিয়া কারবারের সম্প্রসারণ রোধ করা সম্ভব।

১৮. রপ্তানি নির্ভর উন্নয়ন : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনো দেশ রপ্তানি নির্ভর হলে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায়, টেকসই (Sustainable) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

১৯. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটে। ফলে বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি অর্জিত হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস 'সিডর' আঘাত হানার পর প্রাণহানিসহ যে বিপর্যয় দেখা দেয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদার সহযোগিতার ফলে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। এর মাধ্যমে জনশক্তির মান উন্নয়ন, শিল্পের বিকাশ সাধন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন সবই সম্ভব। তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল বৈদেশিক ঋণনির্ভর না হয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যনির্ভর হওয়া উচিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বসমূহ উপস্থাপন করুন।	

সারসংক্ষেপ

- **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য :** দু বা ততোধিক স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মধ্যে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবার বিনিময় সম্পন্ন হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়?
ক) দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য
খ) একাধিক দেশের মধ্যে বাণিজ্য
গ) এক জেলার সঙ্গে অন্য জেলার বাণিজ্য
ঘ) রাজধানীর সঙ্গে বাণিজ্য

২। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য কী?
ক) অনুকূল বাণিজ্য শর্ত
খ) শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি
গ) আমদানি ব্যয় কম
ঘ) জনশক্তি রপ্তানি

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক) সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয় না
খ) একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ হয়
গ) অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগে অসুবিধা হয়
ঘ) অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানি করা যায় না

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কার্যকর হতে প্রয়োজন
ক) দুই বা ততোধিক দেশ
খ) একই ভৌগোলিক সীমারেখা
গ) অভিন্ন মুদ্রা
ঘ) সরকারি নীতির অভিন্নতা

৫। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে
ক) বিশ্বের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
খ) সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয় না
গ) উদ্বৃত্ত পণ্য অব্যবহৃত থাকে
ঘ) খাদ্য ঘাটতি বাড়ে

৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কী সংঘটিত হয়?
ক) রাজস্বনীতির পার্থক্য নেই
খ) রাজনৈতিক প্রভাব নেই
গ) মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্য ঘটে
ঘ) ভৌগোলিক সীমার গুরুত্ব নেই

৭। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
ক) সম্পদের উত্তম ব্যবহার হয় না
খ) উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি
গ) অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের অসুবিধা
ঘ) দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ হয় না

৮। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য কী?
ক) মূলধন দ্রব্য রপ্তানি
খ) জনশক্তি রপ্তানি
গ) অনুকূল বাণিজ্য শর্ত
ঘ) আমদানি ব্যয় স্বল্প

৯। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে
i. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
ii. শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
iii. অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হওয়ার জন্য আবশ্যক হলোÑ
i. দুটি দেশ ও একটি পণ্য
ii. দুটি দেশ ও দুটি পণ্য
iii. দুটি দেশ ও একই মুদ্রা ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অঞ্জু ও রঞ্জু দুই ভাই। দুজনই ব্যবসায়ী। অঞ্জুর কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্রি হয়। রঞ্জুর কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য যুক্তরাজ্য ও কানাডায় বিক্রয় হয়।

১১। অঞ্জুর ব্যবসাকে কী বলা হয়?

ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
খ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
গ) খুচরা ব্যবসা
ঘ) পাইকারি ব্যবসা

১২। রঞ্জুর ব্যবসায়ের কারণে

i. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়
ii. কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়
iii. বিশ্ববাজারে দেশের সম্মান বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কেরামত আলী এই বৎসর হজ্জে গিয়ে মক্কা-মদিনার মার্কেটগুলোতে বাংলাদেশি আমের জুস দেখতে পেলেন। এতে তিনি খুবই গর্ববোধ করলেন।

১৩। দেশ দুইটি লিপ্ত

ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে
খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে
গ) আমদানি বাণিজ্যে
ঘ) রপ্তানি বাণিজ্যে

১৪। উক্ত বাণিজ্যের ফলে

i. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়
ii. দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়
iii. দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৮.২ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
International and Intra-regional Trade

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Intra-regional Trade) : একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অথবা একই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতাধীন বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্য ও সেবা বিনিময়ের লক্ষ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। অর্থাৎ একই জাতিভুক্ত মানুষের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময় সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। যেমন—বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা ও যশোর এবং অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যেরূপ বাণিজ্য চলে, তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। এরূপ বাণিজ্য একই মুদ্রা, রাজস্বনীতি ও দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে পরিচালিত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) : বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময় আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতিভুক্ত মানুষের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময় সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন—বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের যে ধরনের বাণিজ্য চলে, তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এরূপ বাণিজ্য পৃথক পৃথক মুদ্রা ও রাজস্বনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নিয়ম-কানুনের অধীনে পরিচালিত হয়।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য

আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বা বিশেষীকরণ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হলেও আরও কতিপয় পার্থক্য উভয়ের মধ্যে রয়েছে। নিম্নে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
১. সংজ্ঞা	একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।	বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।
২. ভৌগোলিক সীমা	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম হয় না।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম হয়।
৩. উপাদানের গতিশীলতা	একই দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের উপাদানসমূহ শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তা অত্যন্ত গতিশীল হয়।	বিভিন্ন দেশের মধ্যে জলবায়ু, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা এসবের পার্থক্যের কারণে উৎপাদনের উপাদানসমূহ সহজে গতিশীলতা লাভ করতে পারে না।
৪. মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য বা অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কারণ এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার নিরূপণের প্রয়োজন হয়।

৫. সরকারি নীতি	এই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির কোনো বিভিন্নতা নেই, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সম্পূর্ণ প্রভাব রয়েছে।	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির বিভিন্নতা রয়েছে। এরূপ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু দেশ অংশগ্রহণ করে বিধায় বিভিন্ন দেশের সরকারের বিভিন্ন প্রকার নীতি ও উদ্দেশ্য বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
৬. বাণিজ্য নীতি	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন হয় না।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য পৃথক বাণিজ্য নীতি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের জন্য পৃথক পৃথক বাণিজ্য নীতির প্রয়োজন হয়।
৭. প্রাকৃতিক সম্পদ	একই দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের তেমন বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নেই।	বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের বৈশিষ্ট্যগত যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সৃষ্টি।
৮. বাজার	একই দেশের অভ্যন্তরে বাজারের মধ্যে সামাজিক রুচি, পছন্দ, রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি এসবের তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না।	বিভিন্ন দেশের বাজারগুলো রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক সীমানার দ্বারা পৃথকীকৃত। সামাজিক রুচি, পছন্দ, রাষ্ট্রীয় নীতি এসবের দ্বারা এক দেশের বাজারের সঙ্গে অপর দেশের বাজারের পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
৯. ভোগের পরিমাণ	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মাধ্যমে ভোগের পরিমাণ, ভোগ অভ্যাস স্থির থাকে।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ভোগের পরিমাণ, ভোগ অভ্যাস পরিবর্তিত হয়। কারণ এক্ষেত্রে অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
১০. লেনদেনের ভারসাম্য	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের কোনো সমস্যা নেই।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের সমস্যা বেশ জটিল ও চিরন্তন। এ রূপ বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের সমতা স্থাপনের জন্য মুদ্রার অবমূল্যায়ন, মুদ্রা সংকোচন, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।
১১. নিয়ন্ত্রণ	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কার্যক্রম অবাধে পরিচালিত হয়।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়।
১২. সার্বভৌমত্ব	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়।
১৩. স্বনির্ভরতা	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বৈচিত্র্যময়ের ফলে দেশ স্বনির্ভর হয়।	বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেশ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যেমনÑআমদানি নির্ভর দেশ।
১৪. রুচি ও পছন্দ	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মানুষের রুচি ও পছন্দের তেমন পার্থক্য থাকে না।	বিভিন্ন দেশের মানুষের রুচি, পছন্দ ও সামাজিক রীতিনীতি পরস্পর থেকে পৃথক।
১৫. উৎপাদন ব্যবস্থা	একই দেশের ভেতরে কারখানা আইন, শ্রম ও রাজস্বনীতি ইত্যাদি প্রায় একই রকম থাকে।	পক্ষান্তরে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয় বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই ধরনের দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
১৬. পরিবহন ও বিমা	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পরিবহন ব্যয় তুলনামূলক কম এবং বিমা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক নয়।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবহন ব্যয় তুলনামূলক অধিক এবং বিমা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক।
১৭. রাজনৈতিক প্রভাব	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের তেমন রাজনৈতিক প্রভাব নেই।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রায় রাজনৈতিক প্রভাব মোকাবেলা করতে হয়।

১৮. পৃথক জাতীয় সরকার	প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ জাতীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত। তাই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক নীতির প্রয়োজন নেই।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলোতে পৃথক জাতীয় সরকার বিদ্যমান থাকায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পৃথক এবং স্বাধীন নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থনীতিবিদ **বেনহাম** যথার্থই বলেন, "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক তত্ত্ব কেন? দুটি শব্দে এর কারণ হলো—জাতীয় সরকার।" "(Why a separate theory of International Trade? The reason in two words, is National Government."—Benham)

এছাড়া, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নগদ অথবা ধারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ (উপসাগরীয় যুদ্ধ, বৈশ্বিক মন্দা, আমেরিকার টুইন-টাওয়ার ধ্বংস বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বা পূর্ব এশিয়ায় সুনামির আঘাত) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে না; কিন্তু এসবের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভাবিত হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য অন্য দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য তা প্রয়োজন।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টিতে উভয় বাণিজ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, উভয় বাণিজ্যের ভিত্তি এক হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা মূলত মাত্রাগত—শ্রেণিগত নয়। অধ্যাপক বার্টিল ওহলিন (Bertil O'hlin) এর মতে, "অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সম্প্রসারণই হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এ দু'ধরনের বাণিজ্যের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।"

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান যা মূলত মাত্রাগত, শ্রেণিগত নয়। উভয় বাণিজ্যের মধ্যে এসব পার্থক্যের দরুন অর্থনীতিবিদগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণের জন্য পৃথক বাণিজ্য তত্ত্ব প্রদান করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে দশটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : কমপক্ষে দু'টি দেশ, পৃথক সরকার, সরকারি নীতির বিভিন্নতা, ভিন্ন ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা, পৃথক বাণিজ্যনীতি প্রয়োজন হয়।

খ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য : একই দেশের অভ্যন্তরে, একই সরকার ও সরকারিনীতির মাধ্যমে, একই ব্যাংক ব্যবস্থা ও বাণিজ্যনীতির অধীনে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কী সংঘটিত হয়?

ক) উপাদানসমূহ গতিশীল নয় খ) বাণিজ্যনীতি একই থাকে

গ) ভোগ অভ্যাস পরিবর্তিত হয় ঘ) লেনদেনের সমস্যা জটিল

২। দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে কী বলা হয়?

ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

গ) আঞ্চলিক বাণিজ্য ঘ) জাতীয় বাণিজ্য

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রহমান সাহেব রমজান মাসে সৌদি আরবের খেজুর কিনেছিলেন। পরবর্তীতে হজে গিয়ে মক্কার দোকানে পর্যাপ্ত বাংলাদেশি জুস দেখতে পেলেন। এটা দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

৩। দেশ দুটি লিপ্ত

ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে
খ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে
গ) আমদানি বাণিজ্যে
ঘ) রপ্তানি বাণিজ্যে

৪। উক্ত বাণিজ্যের সুবিধা হলো

i. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়
ii. কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়
iii. দেশের সম্মান বৃদ্ধি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৮.৩ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
Trends in International Trade in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলেও বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্নমুখী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে বিশ্ব বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা এবং দেশীয় বাণিজ্য নীতিতে পরিবর্তনের ফলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি এবং বাণিজ্যের সাম্প্রতিক পরিবর্তন ও গতিধারা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. প্রবৃদ্ধির গতিধারা : বিশ্ব অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরলেও প্রবৃদ্ধির গতি এখনও সুসংহত হয়নি। উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারা শক্তিশালী হলেও বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ২০১১ সাল থেকে ক্রমাগত হ্রাস পায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook, April 2016 অনুযায়ী ২০১৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি ৩.২ শতাংশ, ২০১৭ সালে ৩.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে IMF পূর্বাভাস করেছে।*

মন্দা-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোসহ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ঊর্ধ্বে অর্জন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭ শতাংশের অধিক।*১

২. রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি : ২০০৮-০৯ সময়ের মন্দা পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বেরিয়ে আসার সাথে সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত গত ২০১০-১১ অর্থবছরে সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে যেখানে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪১.৪৭ শতাংশ। ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল গত বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১১.৭০ শতাংশ ও ৩.৪ শতাংশ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০,৬১৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৯.১৭ ভাগ বেশি। উল্লেখ্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো ৪৫,১৯০.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.২৬ শতাংশ বেশি।

৩. দেশভিত্তিক রপ্তানি-আমদানি কার্যক্রম : দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার। ২০১৫-১৬ অর্থবছর জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে মোট রপ্তানির শতকরা ১৮.৫৪ ভাগ

---

* সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬, পৃ. xix

*১. বিবিএস এর সাময়িক হিসাব; দৈনিক প্রথম আলো, জনকণ্ঠ ০৬.০৪.২০১৬ ইং

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে। এরপর ইইউভুক্ত দেশ জার্মানি (শতকরা ১৪.৫৩ ভাগ), যুক্তরাজ্য (শতকরা ১১.১৪ ভাগ) ও ফ্রান্স (শতকরা ৫.২৩ ভাগ)।

দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে (মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ২৩.৯ ভাগ); দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (শতকরা ১৩.৬ ভাগ) এবং সিংগাপুর (শতকরা ৫.৪ ভাগ)।

৪. নতুন বাজার অন্বেষণ : পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার অন্বেষণের জন্য ইতঃপূর্বে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে উল্লিখিত New Market Exploration Assistance এর আওতায় উদ্যোক্তাদের বর্ধিত সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন বাজার হিসেবে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্কে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ : ২০১২-১৩ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহের তুলনায় অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে দাঁড়ায় প্রায় ৩২ বিলিয়ন (৩২,৪৬৬ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার। বর্তমানে এ স্থিতি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।

৬. বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার : ৩১ মে ২০০৩ হতে বাংলাদেশে ভাসমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর টাকার মূল্যমানে তেমন অস্বাভাবিক কোনো অস্থিতিশীলতা দেখা যায়নি যা দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি হ্রাসের কারণে অতি সম্প্রতি মার্কিন ডলারের চাহিদা কমেছে। ফলে বাজারে টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. ট্যারিফ হ্রাসকরণ : সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (MFN) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিলো তা ২০১৩-১৪ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৮. ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ : বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অধিকতর সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) সেল কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রকার কার্যক্রমে বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্ব করে আসছে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত New Partnership for Trade Development Act (NPDTA) এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যস্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিণ্টউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে গঠিত Enhanced Integrated Framework (EIF) Process এ বাংলাদেশ নভেম্বর, ২০০৯ এ যোগদান করেছে। বাংলাদেশ চতুর্থবারের মতো গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত LDC Coordinatorship এর দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯. রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ : সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য কাঠামোতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য এসেছে। অতীতে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য শুধু পাট, চা, চামড়া প্রভৃতি কতিপয় কৃষিপণ্য নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে এসব দ্রব্যের পাশাপাশি মাছ, তৈরি ও হোসিয়ারি পোশাক, হিমায়িত চিংড়ি, টাটকা ফল, তাজা ফুল, পাহাড়ি তাঁত বস্ত্র, অমসৃণ হীরা, ভেষজ ওষুধ, ওষুধি উদ্ভিদ, শাক-সবজি এবং হস্তশিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি অপ্রচলিত পণ্য সংযোজিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্যের চাহিদাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০. অপাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি : আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে অপাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে অপাটজাত দ্রব্যের অবদান ছিল ১০ শতাংশেরও কম। কিন্তু বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯৬ ভাগে উন্নীত হয়।

১১. শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি : স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের মোট রপ্তানি দ্রব্যের শতকরা ৮০ ভাগই ছিল কাঁচামাল ও কৃষিজাত দ্রব্য। বর্তমানে রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ শিল্পজাত দ্রব্য থেকে অর্জিত হয়।

১২. অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি : বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচলিত পণ্যাদি ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক, হস্তশিল্প, পান-সুপারি, শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতি অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৩. সার্কভুক্ত দেশের সাথে বাণিজ্য : সার্ক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর সাফটা ও সাটিশ-এর মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক বহুগুণ প্রসারিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সাথে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। এ ছাড়াও এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা); টিপিএস-ওআইসি; ডেভেলপিং-৮, বিম্সটেক (BIMSTEC) সহ অনেক আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে।

১৪. বেসরকারি খাতে বাণিজ্য : স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের বেসরকারি খাতকে ক্রমবর্ধমান হারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

১৫. মূলধনী দ্রব্যের আমদানি : বাংলাদেশের শিল্পে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে মূলধনী দ্রব্যের আমদানিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে লৌহ, ইস্পাত, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, ভোজ্যতেল ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি অধিক পরিমাণে আমদানি করে থাকে।

১৬. বিলাসজাতীয় দ্রব্যের আমদানি হ্রাস : সাম্প্রতিককালে বিলাসজাতীয় দ্রব্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এসব দ্রব্যের উপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এতে সরকারের রাজস্ব ও মূলধনী দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পাবে।

১৭. নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা : বৈদেশিক বাণিজ্যে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমদানি নীতি ১৯৯৭-২০০২-এ কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১৮. জনশক্তি রপ্তানি : এদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে জনশক্তি রপ্তানি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বৈশ্বিক মন্দার কারণে ২০১১ অর্থবছরে শ্রমশক্তি রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পেলেও সরকারের কূটনৈতিক প্রক্রিয়া জোরদারকরণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে শ্রমশক্তি রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council-কে আরও কার্যকর, শ্রমিক রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' স্থাপন, শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ

অর্থবছর	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৪-১৫
মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩০৬২	৩৩৭২	১২৮৪৩.৪৩	১৪৪৬১.২	১৫৩১৬.৯১

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক; বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৬।

১৯. বাণিজ্য বিকেন্দ্রীকরণ : স্বাধীনতার পূর্বাপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলেও বর্তমানে পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ ছাড়াও আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

২০. রপ্তানি নীতিতে পরিবর্তন : রপ্তানি বাণিজ্য 'মাল্টি-ফাইবার এ্যারেঞ্জমেন্ট' (MFA) কোটা ব্যবস্থা ১ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখ থেকে বিলুপ্ত হওয়ায় বর্তমানে অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থায় সরকার তুলনামূলক

সুবিধাকে (Comparative Advantage) প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় (Competitive Advantage) রূপান্তরের লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি (২০০৬-২০০৯) বাস্তবায়ন করেন।

২১. লেনদেন ভারসাম্য*[1] পরিস্থিতি : ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়ে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৭১৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪,৫৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য :

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*
-৬৫৬	৪৯৪	৫১২৮	৫৪৮৩	১৪৪৫

* সাময়িক : ডিসেম্বর-২০১৪ পর্যন্ত

২২. ওয়েজ আর্নারস স্কিম : ১৯৭৪/৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশে এ স্কিম চালু করা হয়। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের নাগরিকদের উপার্জিত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ওয়েজ আর্নারস স্কিম প্রবর্তিত হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে তাদের বাংলাদেশি প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং সরকারের আমদানি নীতির মাধ্যমে কতিপয় নির্ধারিত পণ্য আমদানি করতে পারে।

২৩. একচেটিয়া প্রভাব হ্রাস : বর্তমানে আমদানি বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রভাব বিলুপ্ত করে ছোটবড় সকল আমদানিকারকদেরকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

২৪. শক্তিশালী মুদ্রা এলাকার সাথে বাণিজ্য : পূর্বে পাউন্ড-স্টার্লিং-দিনার এলাকার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অধিক ছিল। তবে বর্তমানে এর পাশাপাশি ডলার-ইউরো এলাকার সাথে বাণিজ্যের পরিমাণ বহুগুণ প্রসারিত হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা হতে রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন–

ক. সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের কাঠামোতে যথেষ্ট বৈচিত্র এসেছে। নতুন নতুন অনেক পণ্য এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

খ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে অ-পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. কৃষিজাত দ্রব্যের পরিবর্তে শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি পূর্বাপেক্ষা বহুগণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. ক্রমাগতভাবে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঙ. পূর্বের অদক্ষ, স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির পাশাপাশি বর্তমানে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ. রপ্তানি নীতিকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

একসময় বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য ছিল পাট ও পাটজাত পণ্য নির্ভর। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বৃহত্তম অংশ দখল করেছে তৈরি পোশাক ও নীটওয়ার পণ্য। এরপর রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, হোম টেক্সটাইল, পাটজাতপণ্য, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, প্রকৌশল সামগ্রী এবং অন্যান্য। দেশ ভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার (মোট রপ্তানির ১৮.৫%)। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলো : তৈরি পোশাক, নিট ওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পর জার্মানি (১৪.৫%), যুক্তরাজ্য (১১.১%) ও ফ্রান্স (৫.২%)।*

---

*[1]. একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে বিবেচ্য দেশের সাথে অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনের (দৃশ্যমান + অদৃশ্যমান) ধারাবাহিক হিসাবকে সেই দেশের লেনদেনের হিসাব বা লেনদেনের উদ্বৃত্ত বলে। কিন্তু শুধু মাত্র দৃশ্যমান পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব দেখানো হলে তাকে বাণিজ্যের ভারসাম্য বলে। যেমন–

(ক) রপ্তানি বাণিজ্য = আমদানি বাণিজ্য = দৃশ্যমান বাণিজ্যের ভারসাম্য

(খ) সেবামূলক রপ্তানি = সেবামূলক আমদানি = অদৃশ্যমান বাণিজ্যের ভারসাম্য

(গ) দৃশ্যমান বাণিজ্যের ভারসাম্য + অদৃশ্যমান বাণিজ্যের ভারসাম্য = চলতি হিসেবের খাতে ভারসাম্য বা, লেনদেনের ভারসাম্য।

* বা. অর্থ. সমীক্ষা ২০১৭, পৃ. ৭২।

বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থা

ক. শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি : বাংলাদেশ সাধারণত শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করে। যেমনড় লৌহ, ইস্পাত, পেট্রোল, কয়লা, সিমেন্ট, ওষুধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, কারখানার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। ২০০৮-০৯ ও ২০১৪-১৫) অর্থবছরে প্রধান প্রাথমিক পণ্য, শিল্পজাত পণ্য এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি বাবদ মোট আমদানি ব্যয় যথাক্রমে ২২,৫০৭ এবং ৪০,৭০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

খ. আমদানি ব্যয়-এর তুলনায় রপ্তানি আয় স্বল্প : বাংলাদেশের অর্থনীতি অতিমাত্রায় আমদানিনির্ভর। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ভোগ্যপণ্য এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পজাত পণ্য ও মূলধনী যন্ত্রপাতি বাবদ আমদানি ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য, চা, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য প্রভৃতি রপ্তানি করে দ্রুত আয় বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে এসব অধিকাংশ পণ্য-দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক কিন্তু যোগানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিযোগী অনেক শক্তিশালী দেশ রয়েছে। যেমন– ভারত, চীন, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিযোগী।

গ. খাদ্য আমদানি : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষির নিম্ন উৎপাদনশীলতার জন্য এখানে খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়। প্রতি বছর বাংলাদেশকে বিদেশ হতে ৩০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

ঘ. বিলাসদ্রব্যের আমদানি হ্রাস : বাংলাদেশে বর্তমানে বিলাসদ্রব্যের আমদানি অনেক হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে আমদানি তালিকায় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী, শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রভৃতির উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিলাসদ্রব্যের আমদানি হ্রাস করে মূলধনী দ্রব্য আমদানি করা বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঙ. প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বল্প মূল্যের কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে কিন্তু উচ্চ মূল্যের মূলধনজাত দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করে। এজন্য বাণিজ্য শর্ত সবসময়ই বাংলাদেশের প্রতিকূলে থাকে।

চ. ওয়েজ আর্নারস স্কিম : এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ওয়েজ আর্নারস স্কিমের প্রবর্তন। এ স্কিমের অধীনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বিদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী আমদানি করা হয়।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি ব্যয় অধিক। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান। দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনায় চীনের অবস্থান শীর্ষে (২৯.২%) রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১২.৮%) ও জাপান (৪.৬%)। বিগত কয়েকবছরের তথ্যানুসারে আমদানিকৃত প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ হল গম, চাল, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, তৈলবীজ। মূলধনী যন্ত্রসামগ্রীসহ প্রধান শিল্পজাত আমদানি পণ্যসমূহ হল সুতা, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী ভোজ্য তৈল, সার, স্টেপল ফাইবার এবং ক্লিংকার।

উপসংহারে বলা যায়, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারি খাতের প্রাধান্য ক্রমশ হ্রাস পেয়ে বেসরকারি খাত সেই স্থান দখল করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
(ক) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে? বর্ণনা করুন।	
(খ) বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।	
(গ) বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করুন।	

সারসংক্ষেপ

- সাম্প্রতিককালে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে শিল্পজাত ও অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং মূলধনী দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিলাসদ্রব্যের আমদানি অনেক হ্রাস পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশি পণ্যের সর্বোচ্চ আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশগুলো যথাক্রমে
ক) আমেরিকা ও ভারত খ) আমেরিকা ও চীন গ) ভারত ও আমেরিকা ঘ) চীন ও আমেরিকা

২। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকারের পদক্ষেপ কী হতে পারে?
ক) শুল্ক বৃদ্ধি খ) ভর্তুকি হ্রাস গ) ভর্তুকি বৃদ্ধি ঘ) জ্বালানির দাম বৃদ্ধি

৩। রপ্তানিমুখী শিল্পের মাধ্যমে
ক) জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষা পায় খ) মধ্যবর্তী দালালদের প্রভাব হ্রাস পায়
গ) পল্লি অর্থনীতির বিকাশ ঘটে ঘ) দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

৪। রপ্তানি বৃদ্ধিতে যে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে
i. রপ্তানি আয়ের উপর কর রেয়াত
ii. রপ্তানি ঋণ বৃদ্ধি
iii. খাদ্যদ্রব্য আমদানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। বাংলাদেশে আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয় অপেক্ষা বেশি হওয়ার কারণ
i. বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ
ii. শ্রমনির্ভর শিল্প উৎপাদনে জড়িত
iii. রপ্তানি পণ্য বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
জনাব সালাম সাহেব ঢাকার বিখ্যাত 'লাল-সবুজ' গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের মালিক। কিছুদিন যাবৎ দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে তার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও দাম উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে তিনি তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন।

৬। উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে
ক) রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে খ) রপ্তানি হ্রাস পাবে
গ) আমদানি হ্রাস পাবে ঘ) পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে

৭। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের উপায় হলো
i. তৈরি পোশাকের পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ
ii. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৮.৪ বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্য
Export Items and Import Items of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য*

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় এদেশ প্রধানত শিল্পের কাঁচামাল ও কৃষিদ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। তবে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতিতে বেশ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

(ক) প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ (Traditional Export Goods) ও

(খ) অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ (Non-Traditional Export Goods)।

বর্তমান বিশ্ববাজারে বিভিন্নমুখী চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদন বা সরবরাহ খাতেও এর পরিমাণগত এবং মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটেছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রব্যসমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা—(i) **প্রাথমিক পণ্য** এবং (ii) **শিল্পজাত পণ্য**। প্রাথমিক পণ্যের মধ্যে—হিমায়িত খাদ্য, চা, কৃষিজাত পণ্য, কাঁচা পাট এবং অন্যান্য। শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে—ওভেন পোশাক, নিটওয়্যার, চামড়া, পাটজাত পণ্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, জুতা, সিরামিক সামগ্রী, প্রকৌশল দ্রব্যাদি, পেট্রোলিয়াম উপজাত, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য এবং অন্যান্য।

নিচে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের বিবরণ দেওয়া হলো :

(ক) প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ

বাংলাদেশ যে সকল দ্রব্য সচরাচর বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে আসছে, সেগুলোকে প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলে। প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ নিম্নরূপ :

(i) কাঁচাপাট : বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কাঁচা পাট অন্যতম। প্রতি বছর এদেশে প্রায় ২৫ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হয়, প্রায় ৭৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়। দেশীয় চাহিদা মেটানোর পর প্রতি বছর প্রায় ১৫-১৮ লক্ষ বেল পাট বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ২০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে রপ্তানি থেকে আয় হয় যথাক্রমে ২৩০ এবং ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(ii) চা : বর্তমানে ১৬৭টি চা বাগানে প্রায় ৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে চা চাষ হয় এবং প্রতি বছর প্রায় ৫০.০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়। এর ফলে দেশের চাহিদা পূরণের পরও বছরে প্রায় ৩০ মিলিয়ন কেজি চা বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, পাকিস্তান, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, মিসর, জার্মানি, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের চা-এর প্রধান ক্রেতা। ২০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে রপ্তানি আয় হয় যথাক্রমে ২ এবং ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

* সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬

(iii) চামড়া : বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিযোগ্য পণ্য হলো চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য। বাংলাদেশের গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুর চামড়া মানে ও গুণে উন্নত। তাই বিদেশে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ভারত, রাশিয়া, ব্রিটেন, জাপান, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে কাঁচা ও পাকা চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে আয় হয় যথাক্রমে ৪০০ ও ১১৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(iv) কাগজ, নিউজপ্রিন্ট ও কাগজজাত দ্রব্য : বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্য হলো কাগজ, নিউজপ্রিন্ট ও কাগজজাত দ্রব্য। এদেশের কাগজ মিলগুলোতে প্রচুর কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট প্রস্তুত হয় এবং নানা ধরনের কাগজজাত দ্রব্য তৈরি হয়। এ খাত হতে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ৩-৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে। ভারত, পাকিস্তান, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, ইরান, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে কাগজ, নিউজপ্রিন্ট ও হার্ডবোর্ড রপ্তানি করা হয়।

(v) ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ও সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সেল ইস্টার্ন পেট্রোলিয়াম লিঃ কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ চট্টগ্রামস্থ ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড-এ অপরিশোধিত খনিজ তেল ও পেট্রোলিয়াম শোধন করে। এখানে উপজাত হিসেবে ন্যাপথা ও ফার্নেস তেল উৎপাদিত হয় যা দেশের চাহিদা পূরণের পর রপ্তানি করা হয়। এছাড়া দেশে তৈরি বিটুমিনও রপ্তানি করা হয়। ২০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে অর্জিত আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩১৪ ও ৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(খ) অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ

কিছুদিন পূর্বেও যেসব দ্রব্য বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হতো না, কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি করা হয়, তাকে অপ্রচলিত দ্রব্য বলা হয়। এসব দ্রব্যের মধ্যে তৈরী পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য যেমন— শাকসবজি ও ফলমূল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক হিসেবে বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে অপ্রচলিত দ্রব্যের অবদান শতকরা প্রায় ৮০ ভাগেরও বেশি। নিচে বাংলাদেশের কয়েকটি অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

১. তৈরী ও হোসিয়ারি পোশাক : বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তৈরী পোশাক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে এ খাতকে অপ্রচলিত বললে ভুল হবে। কারণ ওভেন পোশাক এবং নিটওয়্যার মিলে এটি মোট রপ্তানি আয়ের মধ্যে একক বৃহত্তম খাত। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে, বাংলাদেশের তৈরী প্যান্ট, শার্ট, জ্যাকেট প্রভৃতির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের তৈরী পোশাক এবং নিটওয়্যার-এর মান উন্নত হওয়ায় এর চাহিদা এবং রপ্তানি আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে রপ্তানি আয় অর্জিত হয় যথাক্রমে ২১,৫১৬ ও ২৫,৪৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২. হিমায়িত খাদ্য : বাংলাদেশের অপর একটি প্রধান রপ্তানিজাত দ্রব্য হলো হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী। বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ মৎস্য ও হিমায়িত চিংড়ি, ব্যাঙের পা, শুঁটকি প্রভৃতি রপ্তানি করে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এসব দ্রব্য সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ইতালি, ভারত, হল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে রপ্তানি করা হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে অর্জিত আয় যথাক্রমে ৫৪৪ ও ৫৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩. শাকসবজি ও ফলমূল : সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য যেমন—শাকসবজি, ফলমূল, পান, সুপারি, গোলআলু, মসলা প্রভৃতি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহ ও ভারতে এসব দ্রব্য রপ্তানি করে।

৪. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য : বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশের হস্তশিল্পের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। তাই এ খাতে আমাদের রপ্তানি আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাতে তৈরী কার্পেট, অলঙ্কার ও অন্যান্য হস্তশিল্প দ্রব্য রপ্তানি করে ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ যথাক্রমে ৬ এবং ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে উপার্জন করে।

৫. সার ও রাসায়নিক দ্রব্য : বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কিছু পরিমাণ অশোধিত ও পরিশোধিত সার এবং রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। ভারতসহ প্রতিবেশী কয়েকটি দেশে সাধারণত এসব দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। এ খাত হতে বাংলাদেশ ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ৯৩ এবং ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে উপার্জন করে।

৬. টেরিটাওয়েল ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল : বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে টেরিটাওয়েল ও স্পেশালাইজ্ড টেক্সটাইল নতুন সংযোজন। এ খাতে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এখাতে ১০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।

৭. জুতা : বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সাম্প্রতিক সংযোজন হলো জুতা রপ্তানি। ভবিষ্যতে এ খাতের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল। ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে অর্জিত আয় যথাক্রমে ৪১৯ ও ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৮. সিরামিক সামগ্রী : প্রতি বছর সিরামিক সামগ্রী রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০০৯-১০ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এখাত হতে আয় হয় যথাক্রমে ৩০.৭৮ ও ৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৯. অন্যান্য দ্রব্য : উপরিউক্ত দ্রব্যসমূহ ছাড়াও আরও কিছু অপ্রচলিত পণ্যসামগ্রী বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়ে থাকে। এ ধরনের দ্রব্যের মধ্যে পেট্রোলিয়াম উপজাত, দিয়াশলাই, গুড়, পার্টেক্স, রেয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, বই পুস্তক, সাময়িকী, ফিচার ফিল্ম, রেশম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ২০০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে অর্জিত আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮০০ ও ৫৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশ্বমন্দা পরিস্থিতি হতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭,০২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.২ শতাংশ বেশি।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের এ সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হলে উৎপাদন বহুমুখীকরণ এবং উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কমাতে হবে। মোট উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যের গুণগতমান উন্নত করতে হবে।

সাম্প্রতিক তথ্য-রপ্তানি আয় :

নিচের সারণিতে পণ্য রপ্তানি আয় দেখানো হলো :

দ্রব্যসমূহ	মোট রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		
	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৪-১৫
ক. প্রাথমিক পণ্যসমূহ			
১. কাঁচা পাট	২৬৬	২৩০	১১২
২. চা	৩	২	৩
৩. হিমায়িত খাদ্য	৫৯৮	৫৪৪	৫৬৮
৪. কৃষিজ পণ্য	৩০৪	৩৫১	৩৩৯
৫. অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৯৬	১৮৩	২৪৪
খ. শিল্পজাত পণ্য			
৬. পাটজাত পণ্য	৭০১	৮০১	৭৫৭
৭. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৩৩০	৪০০	১১৩১
৮. ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন	২৭৫	৩১৪	৭৮
৯. তৈরী পোশাক	৯৬০৩	১১০৪০	১৩০৬৫
১০. নিটওয়্যার	৯৪৮৬	১০৪৭৬	১২৪২৭
১১. রাসায়নিক দ্রব্য	১০৩	৯৩	১১২

১২. জুতা	৩৩৬	৪১৯	১৯০
১৩. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫	৬	৯
১৪. ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৩৭৬	৩৬৮	৪৪৭
১৫. অন্যান্য শিল্প পণ্য	১৮২০	১৮০০	৫৪৪
সর্বমোট রপ্তানি	**২৪৩০২**	**২৭০২৭**	**৩১২০৯**

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৬।

বাংলাদেশের আমদানি দ্রব্য

দরিদ্র ও জনবহুল বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (ক) দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য বা ভোগ্যপণ্য (Consumer's Goods), (খ) শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Industrial Raw Materials) এবং (গ) মূলধনী দ্রব্য (Capital Goods)। এছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করা হয়। নিচে এদের বিবরণ দেওয়া হলো :

(ক) ভোগ্যপণ্য : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হয়। এ খাতে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রধান প্রধান ভোগ্যপণ্যসমূহের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

(i) খাদ্যশস্য : বাংলাদেশে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চাল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। যেমন—

সাল	আমদানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার হিসাবে)
২০০১-০২	১৮৬ (চাল ও গম)
২০০৫-০৬	৪১৮ (চাল ও গম)
২০০৭-০৮	১৪১১ (চাল ও গম)
২০১২-১৩	৭২৬ (চাল ও গম)
২০১৩-১৪	১,৪৬৫ (চাল ও গম)
২০১৪-১৫	১,৪৯১ (চাল ও গম)

[সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬]

(ii) তৈলবীজ : বাংলাদেশের চাহিদানুযায়ী তৈলবীজ উৎপাদন হয় না। তাই প্রতি বছর বিদেশ থেকে তৈলবীজ আমদানি করতে হয়। ২০১২-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তৈলবীজ আমদানির জন্য যথাক্রমে ২৪২ ও ৪৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়।

(iiii) অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম : বাংলাদেশের আমদানি পণ্যের মধ্যে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উল্লেখযোগ্য। ২০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ সময়ে বাংলাদেশে এ খাতে ব্যয় হয় যথাক্রমে ১১০২ এবং ৩১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(iv) কাঁচা তুলা : বাংলাদেশ বিদেশ হতে কাঁচা তুলাও আমদানি করে। ২০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ সালে কাঁচা তুলা আমদানির জন্য যথাক্রমে ২০০৫ ও ২২৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়।

(খ) শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ : বাংলাদেশ যেসব শিল্পদ্রব্য আমদানি করে সেগুলো নিম্নরূপ :

(i) ভোজ্যতেল : বাংলাদেশ প্রতি বছর ভোজ্যতেল আমদানির জন্য প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে। ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ সময়ে ভোজ্যতেল আমদানির জন্য এ খাতে ব্যয় হয় যথাক্রমে ১৪০২ ও ৯২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(ii) পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য : বাংলাদেশে খুব সামান্য পরিমাণে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী উৎপন্ন হয়। তাই প্রতি বছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী আমদানি করতে হয়। ২০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ সময়ে এ খাতে ব্যয় হয় যথাক্রমে ৩৬৪২ ও ২০৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(iii) সার : বাংলাদেশ প্রতি বছর বেশকিছু পরিমাণ সার আমদানি করে। অবশ্য এদেশে অনেকগুলো সার কারখানা আছে। কিন্তু এখনও সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ সময়ে এ খাতে ব্যয় হয় যথাক্রমে ১১৮৮ ও ১৩৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(iv) ক্লিংকার : বাংলাদেশকে অতীতে প্রতি বছর বিদেশ হতে প্রচুর পরিমাণ সিমেন্ট আমদানি করতে হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ এ খাতে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় এর কাঁচামাল ক্লিংকার আমদানি ব্যয় দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ২০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ক্লিংকার আমদানি খাতে ব্যয় হয় যথাক্রমে ৪৮৭ এবং ৬৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(v) সুতা : পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের জন্য বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ কারখানায় উৎপাদিত সুতা আমদানি করে। এ খাতে মোট আমদানি ব্যয়ের ৭% থেকে ৯% ব্যয় হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ সময়ে এ খাতে ব্যয় হয় যথাক্রমে ১৩৫৬ ও ১৮৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(vi) স্টেপল ফাইবার : পোশাক শিল্পের প্রয়োজনে বাংলাদেশকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ স্টেপল ফাইবার আমদানি করতে হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ সময়ে এ খাতে ব্যয় হয় যথাক্রমে ৪৫৪ ও ১০৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(গ) মূলধনী দ্রব্য : কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়নের প্রয়োজনে বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য, যেমন— কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কৃষি যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, ইঞ্জিন প্রভৃতি আমদানি করতে হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ সময়ে এ খাতে ব্যয় হয় যথাক্রমে ১৮৩৫ ও ৩৩২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ চিনি, শিশু খাদ্য, সিগারেট, তামাক, সিল্ক বস্ত্র, কয়লা, কেরোসিন তেল, টায়ার, টিউব, রবারজাত দ্রব্যসামগ্রী, ঢেউটিন, ড্রাইসেল ব্যাটারি, ব্রেকওয়েল, বল, বিয়ারিং, বৈদ্যুতিক বাল্ব, মোটর সাইকেল, সাইকেল, স্কুটার, ঘড়ি, রেডিও, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার, বই, পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র, এক্সরে ফিল্ম ইত্যাদি আমদানি করে থাকে।

২০০৫-০৬ সাল থেকে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে আমদানি ব্যয় এবং মোট আমদানি ব্যয় নিম্নরূপ :

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৪-১৫
(ক) প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহ :	১৮৫৪	২০৬৯	৪১৪৯	৪০৭৫	৪৫৩৭
চাল	১১৭	১৮০	২৮৮	৩০	৫০৮
গম	৩০১	৪০১	৬১৩	৬৯৬	৯৮৩
তৈল বীজ	৯০	১০৬	১৭৭	২৪২	৪৩৪
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৬০৪	৫২৪	৯৮৭	১১০২	৩১৬
কাঁচা তুলা	৭৪২	৮৫৮	২০৮৪	২০০৫	২২৯৬
(খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ :	৩০০২	৩৫৬৮	৯২৬৩	৮৫২৯	৭৯০৬
ভোজ্য তেল	৪৭৩	৫৮৩	১৬৪৪	১৪০২	৯২৪
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী	১৪০০	১৭০৯	৩৯২২	৩৬৪২	২০৭৬
সার	৩৪২	৩৫৭	১৩৮১	১১৮৮	১৩৩৯
ক্লিংকার	২১০	২৪০	৫০৪	৪৮৭	৬৩৮
স্টেপল ফাইবার	৭৬	৯৭	৪২৮	৪৫৪	১০৭৮
সুতা	৫০১	৫৮২	১৩৮৪	১৩৫৬	১৮৫১
(গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী :	১৫৩৯	১৯২৯	২০০৫	১৮৩৫	৩৩২১
(ঘ) অন্যান্য পণ্য (EPZ সহ)	৮,৩৫১	৯,৫৯১	২০,০৯৯	১৯৬৪৫	২৪৯৪০
সর্বমোট (ক+খ+গ) :	**১৪৭৪৬**	**১৭১৫৭**	**৩৫৫১৬**	**৩৪০৮৪**	**৪০৭০৪**
শতকরা পরিবর্তন	১২.২	১৬.৪	৫.৫	-৪.০	–০.১

[**সূত্র :** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬]

বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানি করে থাকে। এসব দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চীন এরপর ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, পাকিস্তান, জার্মানি, কানাডা, ফ্রান্স, ইরান, ইরাক, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি প্রধান।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নানাবিধ চাহিদা মিটানোর প্রয়োজনে বর্তমানে এদেশের রপ্তানির চেয়ে আমদানির পরিমাণ অধিক। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের নিজস্ব উৎপাদনের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়, এ কারণে প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যগুলোর একটি সূচি বা তালিকা তৈরী করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য–

(ক) রপ্তানি দ্রব্য : প্রচলিত দ্রব্য হলো– কাঁচাপাট, চা, চামড়া, কাগজ, ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন। অপ্রচলিত দ্রব্য হলো– তৈরী ও হোসিয়ারি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য ও শাকসবজি-ফলমূল।

(খ) আমদানি দ্রব্য : ভোগ্যপণ্য যেমন– খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, কাঁচা তুলা প্রভৃতি। শিল্পজাত দ্রব্য যেমন– ভোজ্যতেল, পেট্রোলিয়ামজাত, সার, ক্লিংকার এবং মূলধন দ্রব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য?
ক) তৈরি পোশাক খ) কাঁচা পাট
গ) চা ঘ) চামড়া

২। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বৃহৎ বাজার কোনটি?
ক) মধ্যপ্রাচ্য খ) যুক্তরাজ্য
গ) ইইউ ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৩। বাংলাদেশি পণ্যের সর্বোচ্চ আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশগুলো যথাক্রমে
ক) আমেরিকা ও ভারত খ) আমেরিকা ও চীন
গ) ভারত ও আমেরিকা ঘ) চীন ও আমেরিকা

৪। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলো কী?
ক) তৈরি পোশাক ও চামড়া খ) প্রসাধনী ও কাগজ
গ) রাসায়নিক দ্রব্য ও ভোজ্য তেল ঘ) খনিজ তেল ও চা

৫। বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন কোন সংস্থাটির দায়িত্ব?
ক) জাতীয় রপ্তানি কাউন্সিল খ) রপ্তানি উন্নয়ন ফোরাম
গ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ঘ) রপ্তানি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৬। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে কোন শিল্পের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রয়েছে?
ক) পোশাক শিল্প খ) পাট শিল্প
গ) চা শিল্প ঘ) চামড়া শিল্প

৭। বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্য হলো
ক) পাটজাত দ্রব্য
খ) চামড়াজাত দ্রব্য
গ) শিল্পের কাঁচামাল
ঘ) কৃষি উপকরণ

৮। কোনটি বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য?
ক) তৈরি পোশাক
খ) হিমায়িত খাদ্য
গ) চামড়াজাত দ্রব্য
ঘ) পান সুপারি

৯। ভোজ্যতেল কোন ধরনের আমদানিকৃত পণ্য?
ক) প্রাথমিক
খ) শিল্পজাত
গ) মূলধনী
ঘ) অন্যান্য

১০। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান ক্রমশ
i. হ্রাস পাচ্ছে
ii. বৃদ্ধি পাচ্ছে
iii. স্থবির রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i
খ) ii
গ) iii
ঘ) ii ও iii

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জনাব সালাম সাহেব ঢাকার বিখ্যাত 'লাল-সবুজ' গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের মালিক। কিছুদিন যাবৎ দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে তার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও দাম উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে তিনি তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন।

১১। উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে
ক) রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে
খ) রপ্তানি হ্রাস পাবে
গ) আমদানি হ্রাস পাবে
ঘ) পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে

১২। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের উপায় হলো
i. তৈরি পোশাকের পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ
ii. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৮.৫ বাংলাদেশে রপ্তানি উন্নয়ন নীতি
Export Promotion Policy in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে রপ্তানি নীতির লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যনীতি সম্প্রসারণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- রপ্তানি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

রপ্তানি উন্নয়ন নীতি

দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান ও ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে রপ্তানি নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানি পণ্যের গুণগতমান ও প্রতিযোগী মূল্য নিশ্চিত করা, পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণ, সম্ভাবনাময় তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক পণ্য ও সেবা রপ্তানির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, রপ্তানি সম্প্রসারণে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ, বাণিজ্যিক উইংসমূহের কার্যক্রমকে গতিশীল করা, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮-এ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে দেশে অধিক পরিমাণে শ্রম নির্ভর রপ্তানি শিল্প স্থাপন, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্রদান, সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রপ্তানিমুখী শিল্পে আন্তর্জাতিক মানের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা সহজীকরণ, রপ্তানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন, পণ্য ভিত্তিক শিল্প এলাকা বা ক্লাস্টার গড়ে তোলা, রপ্তানি শিল্পের পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান, বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন, রপ্তানিকারকদেরকে তাঁদের পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির তথ্য ও বিভিন্ন বাজার সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য নিয়মিতভাবে সরবরাহকরণ, সহজভাবে রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা, চট্টগ্রাম ও মংলা সামুদ্রিক বন্দরের সামগ্রিক উন্নয়নসহ মালামাল খালাস ও গ্রহণ পদ্ধতি সহজীকরণ, পানগাঁওসহ অন্যান্য নদী বন্দরের উন্নয়ন ও চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রপ্তানি বাণিজ্যের সকল কার্যক্রম সহজীকরণের বিষয় রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এবারের নীতিতে ICT, ঔষধ, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, এগ্রো-প্রডাক্ট, ভেষজ সামগ্রী, জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে উদীয়মান সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশে-রপ্তানি নীতির লক্ষ্য

বাংলাদেশে রপ্তানি নীতির মূল লক্ষ্যসমূহ হলো :

১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, চার দেশীয় (বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল-ভুটান) সম্ভাব্য উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ (Connectivity), বৈশ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে বাণিজ্য ব্যবস্থাকে (Trade regime) যুগোপযোগী ও উদারীকরণ করা;

২. আগামী ২০২১ সনের মধ্যে রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণের লক্ষ্যাভিমুখী কার্যক্রম গ্রহণ;

৩. ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে ষষ্ঠ ও সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে রপ্তানি বৃদ্ধি, পণ্য বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্য বহুমুখীকরণ এবং বিভিন্ন দেশের সাথে যৌক্তিকভাবে বাণিজ্য ভারসাম্যের উন্নয়ন;

৪. দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য, অপ্রচলিত পণ্যসহ সব ধরনের পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর মাধ্যমে একটি কমপ্লায়েন্ট সরবরাহ চেইন প্রতিষ্ঠা করা;

৫. প্রতিযোগী মূল্যে মানসম্মত পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা, মান যাচাই পদ্ধতির বিশ্বমানে উন্নয়ন সাধনের বিষয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ, পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, উচ্চমূল্যের রপ্তানি পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন;

৬. রপ্তানিমুখী শিল্পের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য নির্বিঘ্নকরণ ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণ;

৭. রপ্তানিতে ICT সহ সেবা খাতের অংশ বৃদ্ধি, ই-কমার্স ও ই-গভর্নেন্স ব্যবহার করে রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন;

৮. শ্রমনির্ভর রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা। রপ্তানিমুখী শিল্প ও বাণিজ্যে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি;

৯. রপ্তানি বৃদ্ধির সুবিধার্থে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসসহ অবকাঠামোগত সুবিধা সহজলভ্য করা, বন্দরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বন্দরমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;

১০. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিককরণের জন্য ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কার্যক্রম জোরদার করা;

১১. বৈদেশিক মিশনসমূহকে অধিকতর বাণিজ্যবান্ধব করে তোলা;

১২. বাংলাদেশের পণ্যের ব্রান্ডিং করা;

১৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে অধিকতর বাণিজ্যবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিং সার্ভিসকে উৎসাহিত করা;

১৪. আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ; এবং

১৫. রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে রপ্তানি নির্ভর বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ।

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়

বাংলাদেশের মতো একটি সমস্যা জর্জরিত দেশের বহুমুখী সমস্যার সমাধান তথা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। তাই দেশের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করাই বাংলাদেশ সরকারের রপ্তানি নীতির মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ :

১. রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি : বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যাবলি দ্রুত সমাধান এবং রপ্তানি সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানি সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি বা কাউন্সিল বেসরকারি খাতকে রপ্তানি ক্ষেত্রে অধিকতর সুসংগঠিত করার মাধ্যমে পণ্য উন্নয়ন ও বিপণন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেও কাজ করে।

২. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পুনর্গঠন : দেশের রপ্তানি উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার দেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে একটি স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশনে উন্নীত করে।

৩. শুল্ক রেয়াত : রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহদানের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর এবং রপ্তানির পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর হতে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। যেমনÑরপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ; ঔষধ ও টেক্সটাইল শিল্প এবং কৃষিখাতে ব্যবহৃত কাঁচামাল/উপকরণ, কম্পিউটার এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতি; সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশনায় ব্যবহৃত নিউজপ্রিন্ট, কৃষিকাজে ব্যবহার্য কীটনাশক এবং হাঁস-মুরগির খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৪. বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম হ্রাস : রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন খরচ হ্রাসের লক্ষ্যে উক্ত শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম হ্রাস করা হয়েছে।

৫. বাজার সার্ভে : বিদেশে আমাদের দ্রব্যের জন্য আরও অধিক এবং উত্তম বাজার খুঁজে বের করার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইতোমধ্যেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারের উপর সার্ভে সম্পন্ন করেছে। সে অনুযায়ী বর্তমানে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. টাকার মূল্যমান যৌক্তিকীকরণ : আমাদের রপ্তানি কার্যক্রমকে জোরদার করার প্রয়োজনে টাকার বাস্তবভিত্তিক মূল্যমান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বর্তমানে টাকার রূপান্তরকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. আমদানি নীতি উদারকরণ : রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির পদ্ধতি পূর্বাপেক্ষা অনেক উদার ও সহজ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব মোকাবিলায় গঠিত টাস্কফোর্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে গত ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রণোদনা প্যাকেজ-১ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রণোদনা প্যাকেজ-২ ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি এবং রপ্তানি সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কাঁচামাল আমদানি পদ্ধতি সহজ করার মাধ্যমে দেশীয় রপ্তানিকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে তিন বছর মেয়াদি আমদানি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮. ট্যাক্স হলিডে : বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৯. আয়কর সুবিধা : পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য ছাড়াও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের আয়ের উপর, সরকার আয়কর রিবেটের সুবিধা প্রদান করছে। ফলে অপ্রচলিত পণ্যাদির রপ্তানি উৎসাহিত হবে এবং বৃদ্ধি পাবে।

১০. রপ্তানি ঋণ : দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার রপ্তানিকারকদেরকে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে রপ্তানিকারকদের জন্য ঋণের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে রপ্তানি ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১১. পৃথক ক্রেডিট লাইন স্থাপন : সিআইএসভুক্ত দেশসমূহে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানিকারকদেরকে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহের জন্য পৃথক ক্রেডিট লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

১২. বিদেশ ভ্রমণের সুবিধা : রপ্তানি পণ্যের বিপণন প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সহজ শর্তে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নতুন ও ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অনুমোদনক্রমে ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবে।

১৩. ক্রেডিট কার্ড প্রবর্তন : রপ্তানিকারকদের বাণিজ্যিক ভ্রমণকে ঝুঁকিবিহীন, সম্মানজনক ও মর্যাদাসম্পন্ন করার জন্য তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে ক্রেডিট কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪. বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি দ্রব্যের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার সৃষ্টির জন্য সরকার বিভিন্ন সময় বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে থাকে।

১৫. আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদান : বাংলাদেশি পণ্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে সরকারি ও বেসরকারি রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১৬. রপ্তানি পারফর্মেন্স লাইসেন্স : দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার রপ্তানিকারকদেরকে অতিরিক্ত আমদানি লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১৭. বিদেশে বাণিজ্যিক অফিস খোলা : রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার লন্ডন, ওয়াশিংটন, পিকিং, দিল্লি, টোকিও, কলকাতা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বড় বড় শহরে বাণিজ্যিক অফিস খুলেছে।

১৮. বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন : বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে।

১৯. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেছে।

২০. জাতীয় রপ্তানি মেলার আয়োজন : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে সরকার জাতীয় রপ্তানি মেলার আয়োজন করে থাকে।

২১. বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণ : রপ্তানি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।

২২. রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল গঠন : নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টি এবং এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বাণিজ্য বান্ধব (Business friendly) পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ সমন্বিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন, উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, বিপণন তথা রপ্তানির সার্বিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়।

২৩. পুরস্কারের ব্যবস্থা : রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহদানের জন্য সরকার সর্বোচ্চ সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতির ট্রফি, সনদ ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

২৪. মন্ত্রণালয় গঠন : সরকার রপ্তানির সাথে সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় গঠন করেছে যাতে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানো যায়।

রপ্তানি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো :

১. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র (ইপিবি) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, চা বোর্ড এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সক্ষমতা বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান করা এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ;

২. বিএসটিআই-এর উন্নয়ন সাধন;

৩. গবেষণা কার্যক্রমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সংযোগ সৃষ্টি;

৪. ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি জোরদার করে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা;

৫. রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন, পণ্যের ব্যবসা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্যভিত্তিক গঠিত ৬টি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের কার্যক্রম গতিশীল করার পাশাপাশি প্লাস্টিক পণ্যসহ অন্যান্য পণ্যের জন্যেও প্রয়োজনানুযায়ী বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা;

৬. বিদেশে পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কিত তথ্য, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, বাজার সম্প্রসারণ, উচ্চতর মূল্য প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করা এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে শক্তিশালী গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন;

৭. অটোমেশন ও ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের মাধ্যমে রপ্তানি সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা;

৮. ব্যবসার ব্যয় কমিয়ে রপ্তানি পণ্যসমূহকে অধিকতর প্রতিযোগী করা, উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং লীড টাইম কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ই-কমার্সসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণে সহায়তা প্রদান করা;

৯. রপ্তানি বহুমুখীকরণে রপ্তানি বাজার ও প্রযুক্তি সম্পর্কে রপ্তানিকারকদেরকে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা;

১০. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিক, কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং আরো খাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা;

১১. ট্রেডিং হাউস ও রপ্তানি হাউসসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা;

১২. পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান করা;

১৩. শ্রমিকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তাসহ শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা;

১৪. পণ্যের ডিজাইন উন্নয়নে পণ্যভিত্তিক ডিজাইন সেন্টার স্থাপনে উৎসাহিত করা;

১৫. আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত বাণিজ্যিক/ব্যবসায়িক উত্তম চর্চা (best practice/ethical business) অনুসরণে উৎসাহিত করা;

১৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহায়তা করার লক্ষ্যে একক বাতায়ন সেবা কেন্দ্র (Single Window Service Centre) প্রবর্তন;

১৭. রপ্তানিকারকদেরকে organic পণ্য উৎপাদনের জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;

১৮. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বিশেষ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

১৯. আমদানিকারক দেশসমূহের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে রপ্তানিকারকদের পরিচিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা;

২০. অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুদ হারে রপ্তানি ঋণ প্রদানসহ রপ্তানিকারকদেরকে বিভিন্ন আর্থিক ও আর্থিক প্রণোদনা (incentive) প্রদান করা;

২১. রপ্তানিতে লীড টাইম কমিয়ে আনার জন্য বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য খালাস পদ্ধতি সহজীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রবর্তন করে ব্যবসার ব্যয় (cost of doing business) কমিয়ে আনার মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতার শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক পদক্ষেপ নেয়া;

২২. পণ্য পরিচিতি (product branding) ও বহুমুখীকরণ (diversification)-এর জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণ উদ্যোগের আওতায় বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করা, বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা, বিদেশ হতে আগত ক্রেতা প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত বাণিজ্যিক মিশন গ্রহণ এবং পণ্যের বাজার study করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২৩. বিদেশে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবা খাতের বাজার সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা;

২৪. দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, ব্রাজিল, মেক্সিকো, চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়াসহ বিভিন্ন সিআইএস দেশ, সার্কভুক্ত দেশ, এসএডিসিভুক্ত (South African Developing Countries) দেশে পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া, প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট সমাদৃত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২৫. নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন, পণ্য বহুমুখীকরণ, অধিক পণ্য রপ্তানি ইত্যাদি কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন খাতে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকদেরকে সিআইপি মর্যাদা ও জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা;

২৬. 'রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি' কর্তৃক প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এক বা একাধিকবার দেশের রপ্তানি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

২৭. 'রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি' এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' কর্তৃক নিয়মিতভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা;

২৮. ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো-এর সভাপতিত্বে এফবিসিসিআইসহ বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত 'রপ্তানি মনিটরিং কমিটি' কর্তৃক রপ্তানির বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে উচ্চতর পর্যায়ে উপস্থাপন করা; এবং

২৯. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও শীর্ষ ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ মনিটরিং-এর জন্য 'রপ্তানি নীতি মনিটরিং কমিটি' গঠন, কমিটি কর্তৃক রপ্তানি নীতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান; এবং

৩০. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে রপ্তানি সেল প্রতিষ্ঠা।

শিক্ষার্থীর কাজ

(ক) বাংলাদেশের রপ্তানি নীতির লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করুন।
(খ) বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় বর্ণনা করুন।
(গ) রপ্তানি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- **রপ্তানি নীতি :** বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করাই বাংলাদেশ সরকারের রপ্তানি নীতির লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রপ্তানি নীতি ২০১৫-১৮ এ কীসের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে?
ক) প্রতিযোগী মূল্য নিশ্চিত করা
খ) উচ্চ সুদের হার
গ) মূলধন নির্ভর শিল্প স্থাপন
ঘ) আমদানির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি

২। রপ্তানিমুখী শিল্পের মাধ্যমে
ক) জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষা পায়
খ) মধ্যবর্তী দালালদের প্রভাব হ্রাস পায়
গ) পল্লি অর্থনীতির বিকাশ ঘটে
ঘ) দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

৩। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকারের পদক্ষেপ কী হতে পারে?
ক) শুল্ক বৃদ্ধি
খ) ভর্তুকি হ্রাস
গ) ভর্তুকি বৃদ্ধি
ঘ) জ্বালানির দাম বৃদ্ধি

৪। রপ্তানি বৃদ্ধিতে যে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে
i. রপ্তানি আয়ের উপর কর রেয়াত
ii. রপ্তানি ঋণ বৃদ্ধি
iii. খাদ্যদ্রব্য আমদানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৮.৬ বৈদেশিক সাহায্য, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ
Foreign Assistance, Trade & Investment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের অসুবিধা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্য বলতে একটি দেশের জরুরি প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খাদ্য, ওষুধ, প্রকল্প, দান, অনুদান, ঋণ, আর্থিক ও কারিগরি যেকোনো ধরনের দেশ বহির্ভূত সহায়তা গ্রহণ এবং প্রদান উভয়কে বোঝায়।

বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সব বৈদেশিক সাহায্যকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমনÑ

(ক) খাদ্য সাহায্য : এক্ষেত্রে শুধু মাত্র চাল এবং গমকে বোঝানো হয়।

(খ) প্রকল্প সাহায্য : দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যে সাহায্য গ্রহণ বা প্রদান করা হয় তা বোঝায়। যেমন : বঙ্গবন্ধু সেতু প্রকল্প, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাবল রেল লাইন প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প, উত্তর-পশ্চিম সেচ প্রকল্প, মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি।

(গ) অপ্রকল্প সাহায্য : অপ্রকল্প সাহায্য বলতে নানা ধরনের পণ্যসামগ্রীর সাহায্য প্রাপ্তি বোঝায়। যেমনÑ ভোজ্য তেল, টিনজাত দুধ, ডাল, ওষুধপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রভৃতি।

এছাড়াও রয়েছে

সামরিক সাহায্য : কোনো দেশ অপর কোনো দেশ হতে সামরিক ও প্রতিরক্ষা খাতে যে সব সাহায্য গ্রহণ করে থাকে, তাকে সামরিক সাহায্য বলে।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) : বিশেষ করে বিভিন্ন ধনী দেশের পুঁজিপতিরা বেসরকারিভাবে বিভিন্ন দেশে প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ করে থাকে। এটি একটি আকর্ষণীয় প্রাপ্তি এবং বর্তমানে এ ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ বা আমদানি বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপরে উল্লিখিত সাহায্যকে আবার নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়। যেমন

(i) দান, অনুদান ও ঋণ : দান করা অর্থ বা দ্রব্য সাহায্য কখনো দাতা দেশকে ফেরত দিতে হয় না। গ্রহীতা দেশকে দানের অর্থ ব্যয়ের খাত বা উৎস দাতা দেশ নির্ধারণ করে না। অনুদান কোনো বিশেষ খাতে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদান করা হয়। এ অনুদানের অর্থও ফেরত দিতে হয় না। ঋণ কোনো বিশেষ কর্ম বা প্রকল্প ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রহণ করা হয়। ঋণের সুদ ও আসল দুটিই নির্ধারিত সময়ে ফেরত দিতে হয়।

(ii) নগদ সাহায্য ও দ্রব্য সাহায্য : নগদ সাহায্য বৈদেশিক মুদ্রায় (ডলার, ইউরো, পাউন্ড, ইয়েন ...) এবং দ্রব্য সাহায্যÑচাল, গম, যন্ত্রপাতি, সার, পরামর্শক প্রভৃতি আকারে পাওয়া যায়।

(iii) শর্তযুক্ত ও শর্তমুক্ত সাহায্য : যে সাহায্যের সাথে নমনীয় বা কঠিন শর্তযুক্ত থাকে তাকে শর্তযুক্ত সাহায্য আবার যে সাহায্যের সাথে কোনোরূপ শর্ত যুক্ত থাকে না, তাকে শর্তহীন সাহায্য বলে।

বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও অবমুক্তি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	অঙ্গীকার			অবমুক্তি/ব্যয়ন		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৭১-৭২	৫১২	৯৮	৬১০	২৪৫	২৬	২৭১
১৯৮১-৮২	৮০৫	১১১৭	১৯২২	৬৫৪	৫৮৬	১২৪০
১৯৯১-৯২	১১৪০	৭৭৫	১৯১৫	৮১৭	৭৯৪	১৬১১
২০০১-০২	৪০২	৪৭৭	৮৭৯	৪৭৯	৯৬৩	১৪৪২
২০১১-১২	১৪৪১.৩৭	৩৩২৩.১৫	৪৭৬৪.৫২	৫৮৭.৯৯	১৫৩৮.৪৮	২১২৬.৪৭
২০১২-১৩	৫৫৪.৫৩	৫৩০০.০৭	৫৮৫৪.৬০	৭২৬.২৭	২০৮৪.৭২	২৮১১.০০
২০১৩-১৪	৪৯৭.৮২	৫৩৪৬.৪০	৫৮৪৪.২২	৬৮০.৭৩	২৪০৩.৬৬	৩০৮৪.৩৯

উৎস : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৫, পৃ. ৩০৮

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অনুদান (৫৫৭), ঋণ (২৪৭২)সহ মোট ৩০২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গ্রহণ করে। এ থেকে ১৮৮ (সুদ), ৯০৯ (আসল)সহ মোট ১০৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আসল ও সুদ পরিশোধ করে।*

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ উপনিবেশিক শোষণ, যুদ্ধে বিধ্বস্ত, গরিব, জনসংখ্যারভারে আক্রান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত একটি দেশ। বর্তমানে এখনো ৩১.৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। জাতীয় সঞ্চয় GDP এর ২৯.০১ ভাগ। মোট উন্নয়ন পরিকল্পনায় এখনো প্রায় অর্ধেক অপেক্ষা বেশি বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা মেটানো হয়। বৈদেশিক সাহায্যের বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১. স্বল্প সঞ্চয় ও বিনিয়োগ : বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্র। তাদের কম আয়, কম সঞ্চয় অথচ ভোগ অপরিবর্তনীয় বা নানা ধরনের উৎসব দিবস পালনে ব্যয় বেশি হয়ে পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে উন্নয়নের লক্ষ্যে যেরূপ বিনিয়োগের প্রয়োজন তা দেশীয়ভাবে সংস্থান করা সম্ভব হয় না বিধায় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যবধান : বাংলাদেশের মতো জনবহুল উন্নয়নশীল দেশগুলোয় রপ্তানি আয় অপেক্ষা আমদানি ব্যয় অধিক। বাংলাদেশ কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে যা স্বল্প মূল্যের পক্ষান্তরে আমদানি করে মূলধন দ্রব্য ও শিল্পজাত পণ্য যা উচ্চ মূল্যের। ক্রমাগত লাগামহীন আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য বাংলাদেশকে প্রতি বছর ঋণ সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

৩. খাদ্য ঘাটতি : বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ঘাটতির ফলে খাদ্য আমদানি করতে হয়। যে পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত হয় তা দ্বারা ব্যাপক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এছাড়া কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন। তাই সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থেই বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন।

* বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৬

বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের অসুবিধা

বৈদেশিক সাহায্য অনেক সময় গ্রহীতা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হুমকীতে ফেলে। সাধারণত দাতা দেশ ও সংস্থা সাহায্য গ্রহীতা দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের কথা বলে প্রবেশ করে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, সংস্কৃতি, সভ্যতাকে নষ্ট করে। তখন গ্রহীতা দেশে দাতা দেশের কৃষ্টি, সভ্যতাকে পুশইন করে। এর ফলে সাহায্য গ্রহীতা দেশের ঐতিহ্য, সভ্যতার ক্রমবিকাশ হারিয়ে যায়। রাজনীতি কুলশিত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে চরম বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। উন্নয়নের চাকা সামনে অগ্রসর না হয়ে দীর্ঘমেয়াদে অনেক পিছিয়ে পড়ে। অনেক সময় দেশপ্রেমীক, জনদরদী রাষ্ট্রনায়ককে বিদেশি দাতা গোষ্ঠী চক্রান্তের মাধ্যমে হত্যা করে। জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা যাতে জাগ্রত না হয়, সেরূপ কর্মসূচি তারা গোপনে বাস্তবায়ন করে। ক্রমাগত বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণকারী দেশ আত্মমর্যাদা হারিয়ে পরনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হয়। সেজন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পূর্বে ভালোভাবে যাছাই করা প্রয়োজন যে গৃহীত সাহায্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত কী-না? গৃহীত সাহায্য দীর্ঘকালে জনগণের উপর ভার সৃষ্টি করবে কী-না?

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের উপায়

দরিদ্র, জনবহুল বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে উর্ধ্বমুখী, ধাবমান করার লক্ষ্যে প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের বিনিয়োগ প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত অপ্রতুল বিধায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। বৈদেশিক সাহায্যে কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলেও তা স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে হয়। তবে নিজস্ব অর্থনীতিকে দীর্ঘমেয়াদে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে হয়। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের উপায়সমূহ নিম্নরূপ–

১. অভ্যন্তরীণ সম্পদের আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার : অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি, অপচয় রোধ, দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে বিদেশে রপ্তানি করে দেশিয় আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, তৈল, চুনাপাথর, বনজ ও মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সম্পদের আহরণ বৃদ্ধি এবং উত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২. উন্নয়ন বান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি : দেশিয় শিল্পের প্রসার, বিদেশে বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশি মিশনগুলোকে অধিকতর সক্রিয় করার মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশী বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা, বাণিজ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশ নেয়া প্রয়োজন।

এছাড়া, বিদেশি বিলাস দ্রব্য বা কম গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে উক্ত দ্রব্যের আমদানি বিকল্প দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দেশিয় শিল্প সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৩. মুদ্রার অবমূল্যায়ন : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন ঘাটতি বিদ্যমান। এ ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে আমদানি ব্যয় হ্রাস ও রপ্তানি আয় বাড়ানো প্রয়োজন। এ জন্য দেশিয় মুদ্রার মান 'অবমূল্যায়ন' করা হলে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে এরূপ ঘাটতি দূর হতে পারে। এর ফলে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ হ্রাস পাবে।

৪. অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় এবং উৎসব ব্যয় হ্রাস : পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যের অতিরঞ্জিত ব্যবহার রোধ, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বন্ধ এবং উৎসব ব্যয় যথাসম্ভব সংকোচন করা প্রয়োজন।

৫. দেশিয় সঞ্চয়-বিনিয়োগ বৃদ্ধি : জনবহুল, কৃষিজ দ্রব্য অথবা প্রাথমিক পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী দেশের জনগণের স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ দ্বারা পরনির্ভরশীলতা দূর করা কঠিন। এজন্য বাংলাদেশের মত এসব দেশের গ্রামে গঞ্জে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে সমন্বিত করে দেশিয় সঞ্চয়-বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এছাড়াও, দেশিয় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিদেশি সাহায্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। বেকার, অর্ধবেকার, ছদ্মবেকার জনগণকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ রপ্তানি করে দেশিয় আয় বৃদ্ধি করতে পারে। প্রয়োজনে বিদেশি কঠিন শর্তযুক্ত সাহায্য গ্রহণ না করে, বন্ধু রাষ্ট্র হতে শর্তহীন বা তুলনামূলক সহজ শর্তে ঋণ-সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। গৃহীত সাহায্যের ব্যবহার যেন যথাযথভাবে হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

সর্বোপরি, দেশের জনগণের পরনির্ভরশীলতার মনোভাব পরিবর্তন করে স্বনির্ভর ধারায় রূপান্তর করতে পারলে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনামূলক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে

বৈদেশিক সাহায্য কঠিন শর্তযুক্ত, অনেক ক্ষেত্রে সুদের হারও উচ্চ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দাতার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং গ্রহীতা দেশকে পরনির্ভরশীল করে রাখে। বেশিরভাগ সময় বৈদেশিক সাহায্যের সাথে দেশীয় রাজনীতিতে বিদেশিরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে। এর ফলে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ে। এ সুযোগে বিদেশি দেশ বা দাতা সংস্থাগুলো দেশীয় রাজনীতিবিদদেরকে তাদের এজেন্ট বা দালালে পরিণত করে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে পরনির্ভরশীলতা আরো বৃদ্ধি পায়। বিদেশিরা গরিব মানুষকে শোষণ করার সুযোগ পায়।

কিন্তু বাণিজ্য এরূপ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে না যদি রপ্তানিমুখী শিল্প শক্তিশালী হয়, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে। বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনামূলক সুবিধা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বৈদেশিক সাহায্যের সুবিধা : 'বৈদেশিক সাহায্য সর্বদাই খারাপ'এ বক্তব্য সঠিক নয়। বিষয়টি নিম্নরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায়Ñ

(i) পর্যাপ্ত মূলধনের স্বল্পতা : অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের দ্রুত উন্নয়ন সাধনের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন তাদের হাতে নেই। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তা বাধ্য হয়েই বৈদেশিক সাহায্য হতে গ্রহণ করতে হয়।

(ii) আধুনিক শিক্ষার প্রসার : চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত শিক্ষা, গভীর মহাসমুদ্র এবং মহাকাশে সম্পদ আহরণ এবং মানুষের কল্যাণে এর ব্যবহার, যাবতীয় আধুনিক শিক্ষাকে দরিদ্র দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে ব্যবহার বাড়াতে হলে প্রয়োজন বৈদেশিক সাহায্য।

(iii) বৃহৎ অবকাঠামো বিনির্মাণে : বিমান বন্দর, গভীর সমুদ্র বন্দর, মহাসড়ক ও রেল লাইন উন্নয়ন, যমুনা ও পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন, বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্প এরূপ বৃহৎ অবকাঠামো বিনির্মাণে বৈদেশিক সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(iv) প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাব পূরণ : দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তি যা বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে ধনী ও উন্নত দেশ হতে সংগ্রহ করতে হয়।

(v) পারস্পরিক সম্পর্ক : বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, নিজ দেশের পণ্যের বাজার প্রসার, জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নয়ন, বৈদেশিক বিনিয়োগ আহরণ প্রভৃতি বিষয়ে পরিপূরক উদ্যোগ হিসেবে ভূমিকা রাখে বৈদেশিক সাহায্য।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা : উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) এর প্রথম লক্ষ্য ছিল আমদানি বিকল্পন শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশগুলো স্ব-নির্ভরভাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু এ নীতি সফল না হওয়ায় ১৯৬৪ সালে UNCTAD সম্মেলনে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়। তখন ধারণা হলো, রপ্তানি আয় বাড়লে বাণিজ্য ব্যবধান কমে আসবে। স্বল্পকালীন সময়ে বৈদেশিক সাহায্য, বাণিজ্য ব্যবধান, সঞ্চয় ব্যবধান হ্রাসে কার্যকর হলেও দীর্ঘকালীন সময়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সাহায্য নয় বাণিজ্যই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধাসমূহ হলো নিম্নরূপ :

(i) অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাম্য ব্যবহার : বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, সম্পদ আহরণ, পণ্য দ্রব্যের গুণগত মান উন্নয়ন, বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণ এবং নিজস্ব উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৈদেশিক বাণিজ্য অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(ii) দেশের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি : বৈদেশিক সাহায্য অপেক্ষা কোনো দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অগ্রসর হলে, দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী, মূলধন দ্রব্য সস্তায় এবং মান যাচাই করে বিদেশ হতে সংগ্রহ করতে পারবে। নতুবা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহীতা দেশ দাতা দেশের সন্তুষ্টির জন্য উচ্চ মূল্যে, নিম্ন মানের পণ্য নির্ধারিত দেশ হতেই সংগ্রহ করতে বাধ্য থাকতে হয়।

(iii) স্বাধীন উন্নয়ন পরিকল্পনা : বৈদেশিক সাহায্য গ্রহীতা দেশ নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য স্বাধীনভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে না। কারণ দাতা দেশ সাহায্য গ্রহীতা দেশের জন্য এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করেন যাতে দাতা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়, নিজেদের তৈরি মূলধন দ্রব্য বিক্রি এবং উপদেষ্টার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় গ্রহীতা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশ পরিচালিত হলে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।

(iv) বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস : বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশ অগ্রসর হলে উক্ত দেশ স্ব-নির্ভর হতে পারে। এর ফলে বৈদেশিক ঋণের সুদ-আসল পরিশোধের চাপ বা দায় থাকে না।

(v) আত্মনির্ভরশীল হওয়া : বৈদেশিক সাহায্য নয়, বৈদেশিক বাণিজ্যই একটি দেশকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত : বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে, দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করে, মানব সম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যায়। এছাড়া বিশ্ববাজারের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় এবং বিলাস দ্রব্যের আমদানি হ্রাস করে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা যায়।

কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির প্রতি দিন দিন মনোযোগ বাড়াতে হবে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে দেশ যেন শিল্পনির্ভর হয় তার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশীয় দক্ষ পরিকল্পনাকারীকে নিয়োগ দিতে হবে। তাহলে দেশ পরনির্ভরশীলতার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

বিশ্বায়নের এ সময়ে সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ বন্ধ করা যাবে না। কৃষি, শিল্প, জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, জৈব প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় মোকাবিলা, গবেষণা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বময় নতুন নতুন প্রযুক্তির যে উদ্ভাবন হচ্ছে তার সুফল ভোগ করার জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পূর্বে খেয়াল রাখতে হবে

১. গৃহীত সাহায্য যেন কঠিন শর্তযুক্ত না হয়, সুদ মুক্ত বা তুলনামূলকভাবে স্বল্প সুদযুক্ত ও পরিশোধকাল যেন দীর্ঘ হয়।

২. গৃহীত সাহায্য যেন দেশীয় উৎপাদন কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে;

৩. রপ্তানি বাণিজ্য যেন কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয়;

৪. সাহায্য যেন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়;

৫. সাহায্যদাতা দেশ হতে যেন কাঁচামাল আমদানি, বস্ত্র, যন্ত্রাংশ, শ্রম ও কারিগরি সাহায্য এবং পরিবহন সুবিধা গ্রহণ বা আমদানি করতে না হয় অথবা, যথাসম্ভব কম আমদানি;

৬. সাহায্য যেন নির্দিষ্ট প্রকল্পে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয়;

৭. সাহায্যগ্রহীতা, নিজ দেশের প্রয়োজনে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাহায্যের অর্থ যেন বাধাহীনভাবে, স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহার করতে পারে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস, ২০১৬ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী এজ অব ডুয়িং : বিজনেস গ্লোবাল র‍্যাংক-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৭৪তম। তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। তাছাড়া, ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম এবং ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১১৭তম ও ৮৬তম স্থানে রয়েছে।

উল্লেখ্য, বিনিয়োগ বোর্ডের BOI Online Service Tracking (BOST), BOI Investment Management System (BIMS), Online Registration System (ORS) এর মাধ্যমে সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। এছাড়া, অন এরাইভেল ভিসা, ই-ভিসাসহ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সকল ভিসা ও কার্য অনুমতি (work permit) অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াও অনলাইনে করা হয়।

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ষান্মাসিক Enterprise Survey-র মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মোট স্থূল (gross) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৬৯৯.০৫ মিলিয়ন। তন্মধ্যে অবিনিয়োগকৃত প্রবাহের পরিমাণ ৪৬৩.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সরাসরি বিনিয়োগ ২২৩৫.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

লেখচিত্র : বাংলাদেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ

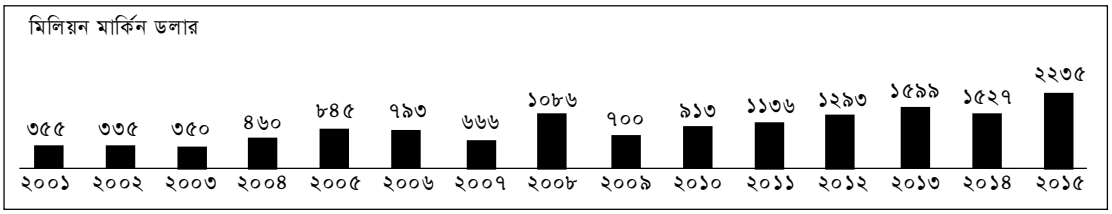

সূত্র : এন্টারপ্রাইজ সার্ভে, বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণিতে বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ দেখানো হলো।

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদিশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিযোগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট ২,৯৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১,০৪৬টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,৬৬,৪২৮.১৪৮ কোটি টাকা।

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ১৭,১১৭.৪৯ কোটি টাকা যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ৫৩,৬৮০.৮৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ নিম্নের সারণি-এ তুলে ধরা হলো :

সারণি : স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৮-০৯	২০১১-১২	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৮২২.৩৩	৬১১৯.৬	৮৫৮৮.৯৩	৬৭২৭.১৫
ফুড এন্ড এলাইড	৪০২.৭৬	১০৮২.২	২৫২৭.৮৩	১২৭০.৯৭
টেক্সটাইল শিল্প	৭৯৪৫.১২	১০৫৫৭.৬	৮৬৬৪.৬৪	১৩৩৪৯.৯৭
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	১৮০.১৩	৪১৫.১	৫৯৮.৩০	৪২৬.১৮
ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প	৩৩.০৪	১৩৮.৬	৪৩৪.৩৬	৬৮৪.৯০
কেমিক্যালস শিল্প	৩০৫৫.৫৯	৯৫৪৯.১	৮১৪৭.১৮	১১৫৬১.৮৩
গণ্ডাস এন্ড সিরামিক শিল্প	৪০৫.৫২	২৪০.০	৫৩৫.০৮	৫৪২.৭৬
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২৭৬১.৫৮	৪৯৫৮.২	৭৩৫৮.৪১	৮০০৯.৮০
সার্ভিস শিল্প	১৪৬৪.৮৯	১৫৫০৬.১	৮৯১৪.২৭	৮৪৬৫.৫৬
বিবিধ শিল্প	৪৬.৫৩	৪৯১০.১	১৪৭৫.২৪	২৬৪১.৭৩
মোট	১৭১১৭.৪৯	৫৩৪৭৬.৬	৪৭২৪৫.৬৭	৫৩৬৮০.৮৭

সূত্র : বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বস্ত্র শিল্প খাতে প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (২৪.৮৭%)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো কেমিক্যাল শিল্প (২১.৫৪%), সার্ভিস (১৫.৭৭%) ও ইঞ্জিনিয়ারিং (১৪.৯২%)।

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাস পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ৯২টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৭,৩৭৭.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, বস্ত্র ও কৃষিভিত্তিক।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে নিবন্ধিত নতুন ৯২টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে সেবা খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৩৪.৭৩%), প্রকৌশল খাতে (২৭.৯৩%)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো-কৃষিভিত্তিক শিল্পখাত (১০.৭৩%) ও বস্ত্রখাত (৬.৭১%)।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর অঞ্চল হিসেবে পূর্ব-এশিয়া দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ সর্বাধিক। এরপর রয়েছে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা এবং সিআইএসভুক্ত অঞ্চল।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায়, বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের খাত এবং প্রয়োজন ব্যাপক। যেহেতু এদেশে প্রয়োজনীয় মূলধনের স্বল্পতা রয়েছে, উদ্যোক্তার স্বল্পতা, কারিগরী প্রযুক্তির স্বল্পতা রয়েছে। বাংলাদেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠি বেকার, জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাই এদেশের দ্রুত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে অধিক হারে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রত্যাশিত এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ

(ক) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য আবশ্যিক কি-না? বিশ্লেষণ করুন।
(খ) বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

বৈদেশিক সাহায্য : বৈদেশিক সাহায্য বলতে একটি দেশের জরুরী প্রয়োজনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণ, দান, অনুদান, পণ্য-দ্রব্য, আর্থিক ও কারিগরি যেকোনো ধরনের দেশ বহির্ভূত সহায়তা গ্রহণ এবং প্রদান উভয়কে বোঝায়।

বৈদেশিক বিনিয়োগ : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI), যৌথ বিনিয়োগ করছে বাংলাদেশে। কারণ, বাংলাদেশে মূলধনের স্বল্পতা রয়েছে, উদ্যোক্তা ও কারিগরী প্রযুক্তির স্বল্পতা রয়েছে। বাংলাদেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী বেকার, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান নিচু। এদের জীবনমান উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। একটি দেশ অপর দেশ হতে 'পণ্যসামগ্রীর সাহায্য প্রাপ্তি'–কী ধরনের সাহায্য নির্দেশ করে?

ক) খাদ্য সাহায্য
খ) প্রকল্প সাহায্য
গ) অপ্রকল্প সাহায্য
ঘ) সামরিক সাহায্য

২। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার ফলে কী হয়?

ক) দেশের স্বার্থ রক্ষা হয়
খ) দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়
গ) দেশকে স্বাবলম্বী করে
ঘ) দেশকে পরমুখাপেক্ষী করে

৩। বৈদেশিক সাহায্যের সুবিধা হলো

i. অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাম্য ব্যবহার
ii. আধুনিক শিক্ষার প্রসার
iii. বৃহৎ অবকাঠামো বিনির্মাণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৮.৭ বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ
Globalization and Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিশ্বায়ন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিশ্লেষন করতে পারবেন;
- বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ বিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বিশ্বায়ন

'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়ন কোনো অবাস্তব ধারণা নয়। বিশ্বায়ন আজ বাস্তবতা। পুঁজিসহ উৎপাদনের সকল উপকরণ এর আন্তর্জাতিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মিল-বন্ধনের দ্বারা একটি বিশ্বগ্রাম (Global Village) প্রতিষ্ঠা করাকে বিশ্বায়ন বলা যায়। এর ফলে, নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সীমানার বিলুপ্তি ঘটে, বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়, বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে অর্থ ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ ঘটে। ১৯৪৭ সনের অক্টোবরে জেনেভায় শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বহুজাতিক সাধারণ চুক্তি (The General Agreement on Tariffs and Trade or GATT) সম্পাদনের সাথে সাথে বিশ্বায়ন ধারণার সূত্রপাত হলেও নব্বই দশকের শেষদিকে এর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিশেষ সম্মেলন-২০০২ এ, অধ্যাপক Abul Barkat (ঢা. বি.) ও HDRC (Human Development Research Centre)-এর সহযোগী গবেষক A. K. M. Maksud কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেন, Globalization has historically been linked to the concentration and centralisation of capital, wealth and power. অর্থাৎ বিশ্বায়ন মূলধন, সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের সাথে ঐতিহাসিকভাবে সংযুক্ত। তাঁরা আরও বলেন, The process of globalization affects global labour markets and labour relations, migration, the use and control of resources, human rights, democracy, cultures and traditions and gender relations. Globalization is manifested in changes in production, technology, trade partners, international investment and finance, and the transmission of cultural values. অর্থাৎ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি বিশ্ব শ্রমবাজার এবং শ্রম সম্পর্ক, স্থানান্তর, সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং লিঙ্গ সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বায়ন উৎপাদন, প্রযুক্তি, বাণিজ্য অংশীদার, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, অর্থায়ন এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন 'বিশ্বায়ন' সম্পর্কে বলেন, "Globalization is the process by which interaction between more people—and therefore between more business, more markets and more economics around the world—is being enabled through technology." অর্থাৎ বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা অধিক জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়। এর ফলে, পৃথিবীব্যাপী অধিক ব্যবসায়, অধিক বাজার এবং অধিক অর্থনীতির মধ্যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটে। যদিও বিশ্বায়নের ফলে বলা হয়েছিল, নিম্নলিখিত সুযোগগুলো সৃষ্টি করবে—

—More employment (অধিক কর্মসংস্থান)—Increased per capita income (মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি)—Improved living standard (জীবনের মানোন্নয়ন)—Improved social conditions (সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন)—Increased investment (বিনিয়োগ বৃদ্ধি)—Technology (প্রযুক্তি)—Manpower (জনশক্তি)—Industrialization & Sustainable development (শিল্পায়ন ও নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন)—Environmental protection (পরিবেশ সুরক্ষা)।

বিশ্বায়নের সুবিধা

বিশ্বায়নের ফলে

(i) উপকরণের গতিশীলতা : বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের গতিশীলতা তথা শ্রম, পুঁজি ও প্রযুক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশ, অঞ্চল ও বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

(ii) নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিনিময় : বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর সকল দেশসমূহের মেধাবীদের সুসমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব হয় এবং বিভিন্ন দেশ এর সুফল ভোগ করতে পারে।

(iii) উদারীকরণ : এ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্য উদারীকরণ, বাজার উন্মুক্তকরণ এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে নেয়ার ব্যাপারে সকল দেশ একমত হয়েছে। ফলে পৃথিবীর সকল প্রান্তের প্রত্যেক মানুষ এর থেকে একইরূপ সুফল লাভ করবে।

(iv) অধিক উৎপাদন : বিশ্বায়নের ফলে সম্পদের সর্বোচ্চ দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হয়, অপচয় রোধ পায়, সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয়।

(v) দাম হ্রাস পায় : অবাধ প্রবাহের কারণে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিভিন্ন পণ্য-সেবার দাম হ্রাস পায়। ক্রেতারা কম দামে ভালো মানের পণ্য ভোগ করতে পারে।

(vi) একচেটিয়া ব্যবসায়ীর অনুপস্থিতি : বহুদেশ বহু উদ্যোক্তার সমন্বয়েই বিশ্বায়ন। তাই এখানে যেকোনো পণ্য-সেবার বিকল্প যোগান একেবারেই পর্যাপ্ত। এরূপ অবস্থায় কোনো পণ্যের শুধু একক যোগান খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

(vii) জীবনের মানোন্নয়ন : বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশের জনগণ উন্নত দ্রব্য-সেবা ভোগের মাধ্যমে উন্নত জীবনের অধিকারী হতে পারে। মানুষের গড় ভোগ, গড় আয়ু বৃদ্ধি পায় এবং জীবনের মানোন্নয়ন ঘটে।

(viii) নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন : বিশ্বায়নের সুফল ভোগ এবং ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, সেবা প্রভৃতি খাতে নির্ভরযোগ্য (Sustainable) উন্নয়ন ঘটে। শিল্পায়নের মাধ্যমে দ্রুত বেকারত্ব হ্রাস পায়। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়।

বিশ্বায়ন যেমন বাস্তবতা সম্পদের অসম বণ্টনও তেমনি বাস্তবতা। বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষের ২৫০ কোটি এখনও দরিদ্র অথচ মাত্র ১০টি বহুজাতিক কর্পোরেশন বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে, উত্তরের দেশগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিশ্বনিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেও সম্পদের মালিকানা ও পরিভোগে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে—এগুলোই হলো প্রেক্ষিত যার মধ্যে চলছে বিশ্বায়ন এবং WTO কেন্দ্রিক বিষয়াদি। ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত উরুগুয়ে রাউন্ড GATT চুক্তিবলে ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) জন্ম গ্রহণের পর পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের অপ্রতিরোধ্য জোয়ার বিশ্বজয়ী হয়ে উঠেছে।

বিশ্বায়নের অসুবিধা

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে*—

(i) শ্রমজীবী জনগণকে **ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের** শিকার করবে। আবার উন্নত জীবনযাপনের মোহে দক্ষ ও মেধাবী জনগণ বিদেশে গমন (Brain drain) এর ফলে দেশ মেধাশূন্য হয়ে পড়বে।

(ii) ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অপরিহার্য **সম্পদ, পরিবেশ অপচয়মূলকভাবে নিঃশেষ** করে দেবে।

(iii) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি সরবরাহ, সেনিটেশন, পরিবেশ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি দ্রব্য ও সেবা **সামাজিকভাবে কাম্য পরিমাণে উৎপাদিত হবে না**।

---

* সূত্র : 'বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন ভাবনা'—ড. মইনুল ইসলাম।

(iv) এরূপ অর্থনীতিতে "প্রতিযোগিতা" চিরদিনই **অলীক স্বপ্ন** থেকে যাবে। বাস্তবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজারের প্রতিযোগিতা এক ধরনের 'মাৎস্যন্যায়' প্রতিষ্ঠাই করে থাকে যেখানে বৃহৎ পুঁজিপতিরা ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিকাশকে পদে পদে বিঘ্নিত করতে থাকবে। এদেশের তৈরী পোশাক শিল্পও চীন, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, হংকং, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে, আরও হবে। ভবিষ্যতে এ শিল্পও গভীর সংকটে পড়তে পারে।

(v) বাজার অর্থনীতি মাদকদ্রব্য, অশ্লীল ছায়াছবি, জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড়, ক্যাসিনো-ক্লাব ইত্যাদির মতো ক্ষতিকর দ্রব্য ও সেবা প্রতিষ্ঠানের পেছনে **সামাজিক সম্পদ অপচয়** করছে এবং আরো করবে। এর ফলে দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রভৃতি অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীরা অবমূল্যায়নের স্বীকার হচ্ছে।

(vi) এরূপ অর্থনীতি **সামাজিক ন্যায় বিচারকে** সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ বিধায় গণদারিদ্র্য, বেকারত্ব, জনসংখ্যা সমস্যা, নিরক্ষরতা, বুভুক্ষা ও পুষ্টিহীনতা সমস্যার অবসান ঘটাতে অপারগ।

(vii) বিশ্বায়নের এ বাস্তবতায় কথিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় উন্নত দেশগুলোর শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোর নিজস্ব পণ্যদ্রব্যের **বাজার ব্যবস্থা ধ্বংস** হবে। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্প কাঠামো ও আওতা উন্নত দেশ অপেক্ষা খুবই দুর্বল। ফলে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হবে, রপ্তানি হ্রাস পেয়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

(ix) অনুন্নত দেশের কৃষিপণ্য বিশ্ব বাজারে সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় না। এর ফলে অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

(x) অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্যোগের ফলে বন-জঙ্গল ধ্বংস হয়ে **প্রাকৃতিক পরিবেশ** হুমকির মুখে পড়বে।

(xi) বিশ্বায়নের ফলে খুব সহজেই **দেশীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ,** ধর্মীয় বিশ্বাস বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। ভিনদেশি অপসংস্কৃতির ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গঠন হুমকির মধ্যে পড়তে পারে।

এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশি জনগণ কীভাবে বিশ্বায়নকে মোকাবিলা করবে, এটিই প্রশ্ন হতে পারে। যেহেতু আমাদের মূলধন বা পুঁজির স্বল্পতা রয়েছে তাই আন্তর্জাতিক শ্রম সম্পদ বাজারে আমাদেরকে যোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এখনই নিজেদেরকে উদ্যোগী হতে হবে। এজন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়নের পথে সফল দেশগুলোর ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে, মানব উন্নয়নে সত্যিকার সফল কোনো দেশ বেশি দিন উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে থাকে না।

অতএব, সার্বজনীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর, বৈষম্যহীন ও সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি ও প্রয়াস চালানোর কোনো বিকল্প নেই।

তথ্য ও টেলি যোগাযোগ প্রযুক্তির চলমান বিপ্লব থেকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য কোনো ফায়দা তুলতে পারেনি। অথচ বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 'তথ্যপ্রযুক্তি'কে ঘিরেই আবর্তিত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য মুক্তির সোনালি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি*

একুশ শতক নানাভাবে আমাদের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও জীব প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের মাধ্যমে এই শতক উৎপাদনশীলতা ও জীবনের মান উন্নয়নেও অপ্রত্যাশিত সব সুযোগ সৃষ্টি করছে। তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে অধ্যাপক M. Lutfar Rahman (D. U.) বলেন, "Information technology (or IT) involves collection, storage, processing and distribution of information." অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তি বলতে বোঝায়, তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বণ্টন।

---

* 'বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি' নয়া অর্থনীতিতে বাংলাদেশ, আতিউর রহমান, আরিফুর রহমান, তাইফুর রহমান, BIDS; থেকে অধিকাংশ সংগৃহীত।

IT শব্দটি মূলত ICT (Information and Communication Technology) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অন্যদিকে বিশ্বায়ন সম্পর্কে অধ্যাপক M. Lutfar Rahman বলেন, "In broad term globalization is the inter-state flow of products, information and technology." অর্থাৎ প্রসারিত অর্থে, বিশ্বায়ন বলতে উৎপাদিত দ্রব্য, তথ্য এবং প্রযুক্তির আন্তঃরাষ্ট্র প্রবাহকে বোঝায়। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে World Bank ও UNDP-এর নিম্নোক্ত দুটি উক্তি স্মরণযোগ্য :

"The cost of transmitting a trillion bits of information from Boston to Los-Angeles has fallen from $ 1,50,000 in 1970 to 12 cents today."—World Bank.

"In 2001 more information can be sent over a single cable in a second than in 1997 was sent over the entire Internet in a month."—UNDP

বহুদিন পরে মনে হচ্ছে এ শতকেই হয়তো দারিদ্র্য নামের ভূতটিকে আমরা আমাদের ঘাড় থেকে নামাতে সক্ষম হব। এ সম্ভাবনার পাশাপাশি নয়া শতাব্দীতে অনেক চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন আমরা। বিশেষ করে প্রশ্ন উঠেছে, নয়া অর্থনীতির নয়া সুযোগগুলো কি সকলের কাছে পৌঁছানো সম্ভব? তথ্যপ্রযুক্তির সুফল বণ্টনকে ঘিরে এ প্রশ্নটি আরও জোরালো হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও একথা আমাদের মানতেই হবে, আজকের যে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব, তা পৃথিবীর চেহারা আমূল বদলে দিতে পারে। পরিবর্তনের হাওয়া এরই মধ্যে বইতে শুরু করেছে। এখন প্রশ্ন, পরিবর্তনের এ হাওয়ার সাথে আমরা তাল মেলাতে পারব তো? ড. মুহম্মদ ইউনূসের ভাষায় "Can Bangladesh take advantage of the coming IT revolution? Of course we can. We can take full advantage of this IT revolution and pull ourselves out of poverty, illiteracy, poor health and poor education, if we prepare ourselves right now to ride the wave of this revolution." এরূপ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে কারণগুলো সুস্পষ্ট। যদিও গোড়াতে তথ্যপ্রযুক্তি একটি উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প, এর বিস্তৃতিতে দরকার হবে নিম্ন প্রযুক্তিনির্ভর কর্মকান্ডে জড়িত বিশাল জনগোষ্ঠীর সমর্থন। আর এক্ষেত্রেই বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে অন্যদের চেয়ে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের দারুণ উৎসাহ এবং নয়া উদ্যোক্তাদের এই খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ এই আশাবাদ তৈরিতে সাহায্য করে চলছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাত থেকেই আগামী দিনে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আহরণ করা হবে, বলা যায়। অর্থাৎ বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উপরই নির্ভর করবে এদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ।

বর্তমানে ইন্টারনেট, ই-কমার্স, এম-কমার্স, ই-গভর্নেন্স, ই-স্বাস্থ্য সুবিধা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসার ঘটছে। বিশ্বায়নের এ যুগে নয়া অর্থনীতির বিকাশে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকাই মুখ্য। এ অর্থনীতিকে সার্বজনীন সুফলধর্মী করতে হলে সুশিক্ষা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সমাজের সর্বস্তরে বিকাশ এবং প্রসারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯' প্রকাশ করেছে। দশটি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নীতিমালায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে কপিরাইট আইন সংশোধন, 'আইসিটি ইনকিউবেটর সেন্টার' স্থাপন, হাইটেক পার্ক স্থাপন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে সফটওয়্যার এবং আইটি সার্ভিসেস রপ্তানি করছে। নকিয়া, জাপান এয়ারলাইনস, বিশ্বব্যাংক, এইচপি, মার্কিন পোস্টাল ও এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের তৈরি সফটওয়্যার ব্যবহার করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত করুন।	

সারসংক্ষেপ

- **বিশ্বায়ন :** বিশ্বব্যাপী পুঁজিসহ উৎপাদনের সকল উপকরণের অবাধ প্রবাহ বোঝায়। এখানে অধিক অর্থনীতির মধ্যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটে, রাষ্ট্রীয় সীমানার বিলুপ্তি ঘটে, সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বিশ্বায়ন বলতে মূলত বুঝায়
ক) অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন
খ) রাজনৈতিক বিশ্বায়ন
গ) ভৌগোলিক বিশ্বায়ন
ঘ) তথ্যগত বিশ্বায়ন

২। বিশ্বায়নের সুবিধা কী?
ক) উপকরণের গতিশীলতা বৃদ্ধি
খ) একচেটিয়া উদ্ভব
গ) দাম হ্রাস
ঘ) ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়

৩। বিশ্বায়ন হলো
ক) অবাধ তথ্য ও যোগাযোগ প্রবাহ, বাণিজ্য প্রবাহ
খ) অবাধ বাণিজ্যের অর্থনীতি
গ) অবাধ তথ্য প্রবাহ
ঘ) শুধু শ্রমের অবাধ স্থানান্তর

৪। বিশ্বায়ন বলতে বোঝায়
ক) বৈদেশিক বাণিজ্য
খ) বৈদেশিক সাহায্য
গ) বৈদেশিক বিনিয়োগ
ঘ) বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠা

৫। বিশ্বায়নের যুগে নতুন অর্থনীতি বিকাশে কার ভূমিকা মুখ্য?
ক) সরকার
খ) জনগণ
গ) শিক্ষা
ঘ) তথ্য প্রযুক্তি

৬। বিশ্বায়নের ফলে যে সব সুযোগের সৃষ্টি হয়
i. অধিক বাণিজ্য
ii. অধিক কর্মসংস্থান
iii. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
কামাল সাহেব নিজ গৃহে তৈরি ডায়রিয়া প্রতিরোধী স্যালাইন অনলাইন বিক্রয় মাধ্যম "কামাল ডট কম" এ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি উক্ত পণ্যের অনেক অর্ডার পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে এটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

৭। উদ্দীপকের বিষয়টি নিম্নের কোন ধারণাকে সমর্থন করে?
ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
খ) পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহ
গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ
ঘ) বিশ্বায়ন

৮। উক্ত বিষয়ের সুবিধা হলো
i. উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
ii. মেধা পাচার হয়
iii. দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর শেষদিকেও রফতানিপণ্য বলতে হাতেগোনা কয়েকটি ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলাদেশে রফতানিক্ষেত্রে কিছু নতুন পণ্য যোগ হয়। তৈরি পোশাক এমনই একটি পণ্য। কাঁচামাল প্রাপ্তি, শ্রমিকের মজুরি, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ ইত্যাদি সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এটির ভূমিকা বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারে উল্লেখযোগ্য। যদি আমরা আইটেম সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রম অসন্তোষ দূর এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করতে পারি তবে আমাদের তৈরি পোশাক বিশ্ব বাজারে ১ম স্থান দখল করবে।

ক) বিশ্বায়ন কী? ১

খ) "বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছু বাণিজ্য ভালো" ।ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানি পণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপক অনুসারে, তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। বান্দরবানে প্রচুর আনারস উৎপাদন হয়। উৎপাদিত আনারসের মান যথেষ্ট ভালো। ব্যবসায়ীরা এ আনারস চট্টগ্রামের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন। আবার সিলেটে প্রচুর ভালোমানের চা উৎপাদন হয়। উৎপাদিত চা-এর আমেরিকার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে।

ক) বাংলাদেশের কয়েকটি আমদানি দ্রব্যের নাম লিখুন। ১

খ) 'বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য আবশ্যক'ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) উদ্দীপকে চা এর বাণিজ্যকে কী নামে অভিহিত করা যায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) আনারস এবং চা এর বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্যসমূহ বিশ্লেষণ করুন। ৪

৩। সফিক একজন সবজি উৎপাদক। প্রথম দিকে তার উৎপাদিত শাক-সবজি দেশের বাজারে বিক্রয় হতো। বিদেশে শাক-সবজির চাহিদা থাকায় এখন সফিক তার উৎপাদিত শাক-সবজি ইংল্যান্ডের বাজারে রপ্তানি করে। সফিকের বন্ধু উজ্জ্বল একটি সরকারি চাকুরি করে। উজ্জ্বলের অফিসে একজন বিদেশি পরামর্শক কাজ করে। এ বিষয়ে সফিক উজ্জ্বলের কাছে জানতে চাইলে উজ্জ্বল জানায় সমযোগ্যতা সম্পন্ন দেশি পরামর্শক থাকা সত্ত্বেও বিদেশি সাহায্যের শর্ত হিসেবে ঐ বিদেশিকে নিয়োগ দিতে হয়েছে। তাকে অনেক বেশি বেতন দিতে হয়।

ক) বিশ্বায়ন কী? ১

খ) 'বৈদেশিক সাহায্য দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে"ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) সফিকের কোন ভূমিকায় বাংলাদেশ বেশি উপকৃত হয়? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকের আলোকে বাণিজ্য ও সাহায্যের মধ্যে কোনটিকে তুমি অগ্রাধিকার দিবে? ব্যাখ্যা করুন। ৪

৪। করিম সাহেব ঢাকা থেকে তৈরি পোশাক ক্রয় করে কুমিল্লার স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেন। তাঁর বন্ধু জামাল সাহেব ভারত থেকে পেঁয়াজ রসুন ক্রয় করে বাংলাদেশে বিক্রয় করেন। আর বাংলাদেশ থেকে শাক-সবজি ও হিমায়িত মাছ সৌদি আরবে বিক্রয় করেন।

ক) বিশ্বায়ন কী? ১

খ) 'রপ্তানি শুল্ক হ্রাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহায়ক' বুঝিয়ে লিখুন। ২

গ) উদ্দীপকে করিম সাহেবের ব্যবসাকে কোন বাণিজ্য বলা হয়? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে করিম সাহেবের ব্যবসায়ের সাথে জামাল সাহেবের ব্যবসার কী পার্থক্য? বিশ্লেষণ করুন। ৪

৫। জনাব সালমান 'Y' দেশে বসবাস করেন। দেশটির পণ্য রপ্তানি আয়ের সারণি নিম্নরূপ :

পণ্য	মোট রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
(১) কাঁচা পাট	২৬৬
(২) হিমায়িত খাদ্য	৫৯৮
(৩) পাটজাত পণ্য	৭০১
(৪) চামড়া	৩৩০
(৫) চা	৩
(৬) তৈরি পোশাক	৯৬০৩
(৭) রাসায়নিক দ্রব্য	১০৩
(৮) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫

রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে দেশটির সরকার নতুন বাজার অনুসন্ধান, বাণিজ্য মেলার আয়োজন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক অফিস খোলা এবং বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ক) বিশ্বায়ন কী? ১

খ) সরকারি নীতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি একই? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত 'Y' দেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রচলিত এবং অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করুন। ৩

ঘ) রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ মূল্যায়ন করুন। ৪

৬। নরসিংদীর মি. সুমন ঢাকার MV গার্মেন্টসের মালিক। তার গার্মেন্টস-এর পণ্য জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ প্রায় সকল ধনী দেশে রপ্তানি হচ্ছে। তার মতো আরও অনেকেই গার্মেন্টসের পোশাকসহ চা, চামড়া, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, মাছ প্রভৃতি দ্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। অন্যদিকে তার বন্ধু রাজীব সাহেব গার্মেন্টস-এর কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি বিদেশ হতে বাংলাদেশে আমদানি করছে। এছাড়া ঔষধ, তৈলবীজ, ভোজ্যতেল, সুতাসহ অন্যান্য অনেক জিনিস বর্তমানে বাংলাদেশে আমদানি হচ্ছে।

ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১

খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত বলতে কী বুঝেন? ২

গ) উদ্দীপক হতে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করুন। ৩

ঘ) সুমন সাহেবের উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠ ৮.১:	১। খ	২। ঘ	৩। খ	৪। ক	৫। ক	৬। গ	৭। ঘ	৮। খ	৯। ঘ
	১০। ক	১১। খ	১২। ঘ	১৩। খ	১৪। ক				
পাঠ ৮.২:	১। খ	২। খ	৩। ক	৪। ঘ					
পাঠ ৮.৩:	১। খ	২। গ	৩। ঘ	৪। ক	৫। গ	৬। ক			
পাঠ ৮.৪:	১। ক	২। ঘ	৩। ঘ	৪। ক	৫। গ	৬। ক	৭। গ	৮। গ	৯। খ
	১০। খ	১১। খ	১২। ক						
পাঠ ৮.৫:	১। ক	২। ঘ	৩। গ	৪। ক					
পাঠ ৮.৬:	১। গ	২। ঘ	৩। গ						
পাঠ ৮.৭:	১। ক	২। ক	৩। ক	৪। ঘ	৫। ঘ	৬। ঘ	৭। ঘ	৮। খ	